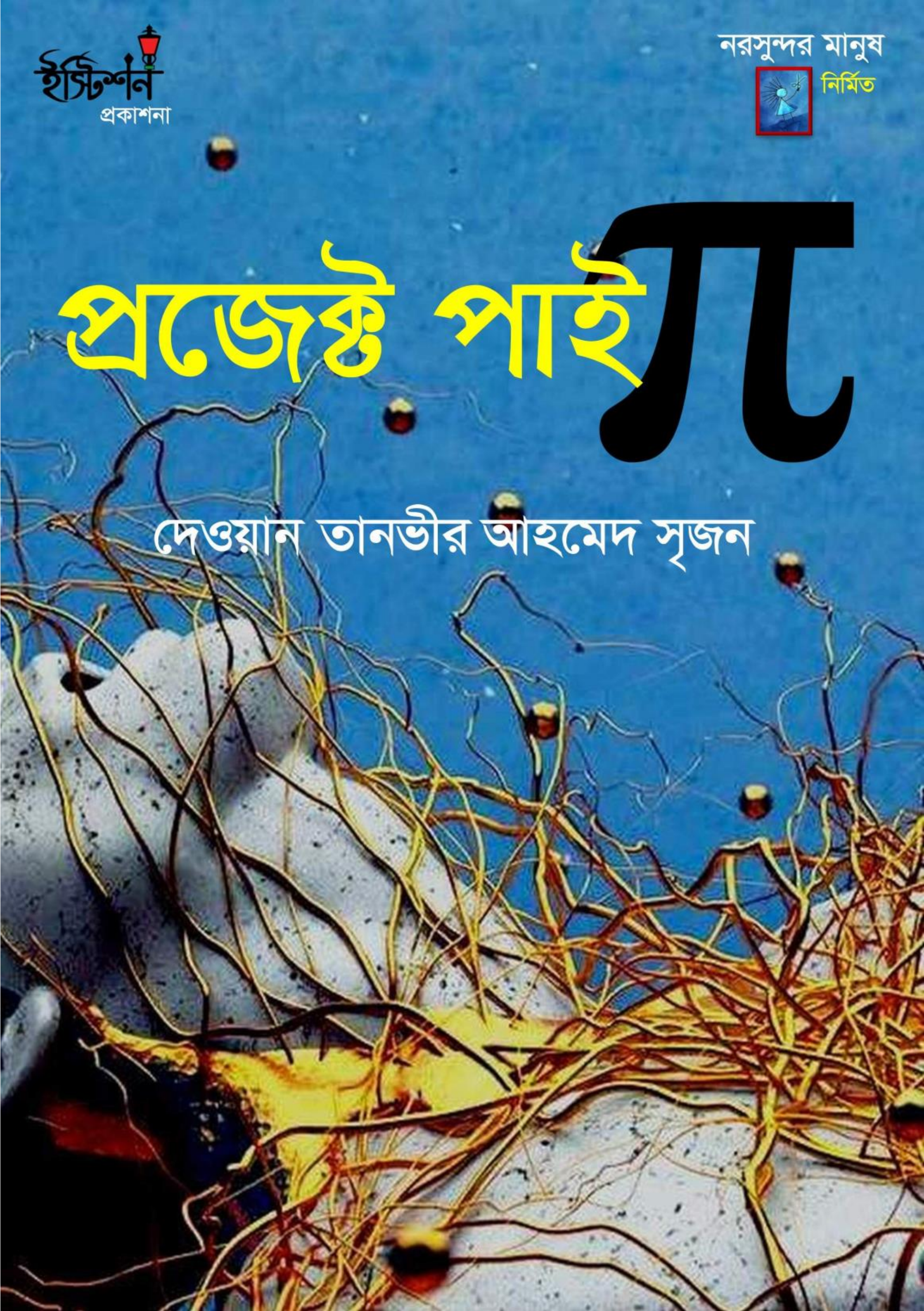

ইস্টিশন প্রকাশনা

নরসুন্দর মানুষ নির্মিত

প্রজেক্ট পাই π

দেওয়ান তানভীর আহমেদ সৃজন

প্রজেক্ট পাই

দেওয়ান তানভীর আহমেদ সৃজন

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.com

প্রজেক্ট পাই

দেওয়ান তানভীর আহমেদ সৃজন

© দেওয়ান তানভীর আহমেদ সৃজন
এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

প্রথম ইবুক প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১৭

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

Project Pi. by Dewan Tanvir Ahmed

Istishon eBook

First eBook Published in **September, 2017**
Created by: NoroSundor Manush

উ ৎ স র্গ

আমার বাবা-মা,

যারা আমাকে

"জয় বাংলা" বলতে শিখিয়েছেন।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যার,

যিনি আমাকে

"জয় বাংলা" বলে গর্জে ওঠার সাহস যুগিয়েছেন।

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

লেখক পরিচিতি। **০৬**

অধ্যায় **১-২৫। ০৭**

পরিশিষ্ট । **১৬০**

শেষ পৃষ্ঠা। **১৬৩**

লেখক পরিচিতি

লেখকের লেখা প্রথম ছোটগল্প "দৈনিক ভূত সমাচার" প্রকাশিত হয় প্রথম আলোর সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র রস+আলো-তে ২০০৯ সালে। এর পরের বছর ২০১০ সালে রম্যগল্প "মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও স্পেসশিপ" ছাপা হয় রস+আলোর একটি পাঠক সংখ্যায়। তারপর ২০১২ সাল পর্যন্ত আরো বেশ কিছু রম্যগল্প প্রকাশিত হয় প্রথম আলোসহ আরও কিছু পত্রিকায়। এরপর ২০১৩ সাল থেকে লেখক "প্রজন্ম ব্লগ" এবং "আমারব্লগ"-এ নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেন "দেওয়ান তানভীর আহমেদ" নামে। সে সময়কার অনেকগুলো লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখাগুলো ছিল- কবিতা: "গেরিলা ১৯৭১", "শাহবাগের সেই নষ্ট ছেলে", "ভুলে যাও একাত্তর"; ছোটগল্প: "যুদ্ধ আজও শেষ হয় নি", "ছমিরন বিবির বিচার" এবং প্রবন্ধ: "হীরক রাজার দেশে-আপগ্রেডেড", "একাত্তর, ত্রিশ লক্ষ প্রাণ, দু' লক্ষ সম্ভ্রম এবং নতুন প্রজন্ম", "ভূলুণ্ঠিত মানবতা", "শিখণ্ডী কথা" ইত্যাদি। বেলুচিস্তানে চলমান পাকিস্তানীদের বর্বরতা নিয়ে লেখা "ভূলুণ্ঠিত মানবতা"সহ আরো কিছু লেখা পশ্চিম বঙ্গের "বেঙ্গল টিউনস" সাইটেও প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও ত্রৈমাসিক পত্রিকা "পড়াবাস্তব"-এও লেখালেখি করেছেন বেশ কিছুদিন। ২০১৪ সাল থেকে লেখালেখি শুরু করেন "বিজ্ঞানস্কুল" এবং "ইস্টিশন" ব্লগে। সেখানে তার লেখা কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ: "পদার্থ ও প্রতি-পদার্থ, এবং রহস্যময় পদার্থবিজ্ঞান", "আপেক্ষিকতা তত্ত্ব", "হাইপেশিয়া: একজন বিপ্লবী নারী বিজ্ঞানী", "সমকামিতা: The Taboo"।

দেওয়ান তানভীর আহমেদ সৃজন

ছাত্র, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং,

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি।

মুঠোফোন: ০১৮৭৯ ১২৭১৩০

ই-মেইল: ahmeddewantanvir@gmail.com

১.

-মীরা।

-বলুন মাস্টার ক্রুগো।

-তোমাদের কাজ কতদূর?

-জেনে খুশি হবেন মাস্টার ক্রুগো, আমাদের ভাইরাস এখন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত।

-চমৎকার! আর ভাইরাসের এ্যান্টিডোট?

-সেটার কাজও প্রায় শেষের পথে মাস্টার ক্রুগো।

-মীরা। তুমি জানো যে অর্ধেক কাজ আমার পছন্দ নয়!

-ক্ষমা করবেন মাস্টার ক্রুগো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, প্রফেসর নীলকণ্ঠ বেঁচে থাকলে আজ এ্যান্টিডোটটা তৈরি করতে এতটা বেগ পেতে হত ন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি সবটা জেনে ফেললেন বলেই......

-আমি কোনো অজুহাত শুনতে চাই না মীরা। আমি চাই কাজ।

-দুঃখিত মাস্টার ক্রুগো।

-তোমাদের ভুলের কারণেই প্রফেসর সবটা জেনে ফেলেছিলো। তা না হলে ওকে আরো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা যেত, আর ভাইরাসের এ্যান্টিডোটটাও তৈরি করিয়ে নেওয়া যেত।

-আপনি চিন্তা করবেন না মাস্টার ক্রুগো। আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

-এ্যান্টিডোটে যেন সামান্যতম কোনো ত্রুটিও না থাকে। কারণ অন্যের ওপর ভাইরাস প্রয়োগ করার আগে সেই ভাইরাস থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখাটা বেশি জরুরী।

-আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মাস্টার ক্রুগো। আমাদের কাজে সামান্যতম ত্রুটিও থাকবে না।

-আমি নিশ্চিন্ত আছি বলেই তো তোমরা এখনও বেঁচে আছ।

২.

“সবাই বইয়ের ২১১ নং পেইজ খুলে সামনে রাখো।” গলা খাকারি দিয়ে বললেন রায়হান স্যার।
“কিন্তু স্যার,” সামনের বেঞ্চ থেকে একজন বলে উঠলো, “আজ তো আমাদের ‘কলিমদ্দি দফাদার’ গল্পটা পড়ানোর কথা ছিল।”

রায়হান স্যার চোখ গরম করে তাকালেন ছেলেটির দিকে। প্রফেসর আতিকুর রশিদ রায়হান, কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। ছাত্রদের হাওয়া বের করে দিতে তার একটা চাহনি-ই যথেষ্ট! আজও তার সেই চাহনি দেখেই ছেলেটি যেন ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে তিনি মেঘস্বরে বললেন, “আমার ক্লাসে আমি কী পড়াব আর কী পড়াব না, সেটা কী আমাকে তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে?” স্যারের ধমক খেয়ে ছেলেটি আরও কুকড়ে গেল, মাথা নিচু করে দাড়িয়ে রইল সে। ছেলেটিকে বসতে ইশারা করলেন রায়হান স্যার। তারপর তার হাতের বইটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলতে শুরু করলেন, “এই লেখকদের নিয়ে আমি একেবারেই হতাশ। মুক্তিযুদ্ধের গল্প, উপন্যাস বা কবিতা লিখতে হলেই যেন সবটুকু ঘৃণা পাকিস্তানিদের ওপর ঢেলে দিতে হবে! আর এইসব গল্প কিনা আবার পাঠ্যও করে!” একটু থেমে পুরো ক্লাসের ছাত্রদের ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন রায়হান স্যার। ছাত্ররা কেউ কিছুই বলল না, কেবল সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল সবাই। তারপর তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, “লেখকরা লিখে লিখুক। কিন্তু সেটা পাঠ্য কেন করতে হবে? শত হলেও এসব তো পলিটিক্যাল ব্যাপার স্যাপার, ছাত্রছাত্রীদের মাথায় এসব পলিটিক্স কী না ঢোকালেই নয়?”
“একটা কথা বলতে পারি স্যার?”

আবীরের কণ্ঠ শুনে একসঙ্গে সবকটি চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। রায়হান স্যার চোখে কিছুটা বিরক্তি নিয়েই তাকালেন ছেলেটির দিকে। ছেলেটি আবীর না হয়ে অন্য কেউ হলে রায়হান স্যারের চোখে বিরক্তির সাথে সাথে বিস্ময়ও থাকত; কিন্তু আবীরের ব্যাপারটা আলাদা।

ইরাবান ইসলাম আবীর, এই কলেজেরই উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের ছাত্র। সে একজন সাংস্কৃতিক কর্মী। শুধু তাই নয়, সে ছোটখাট একজন লেখকও বটে; ব্লগে লেখালেখি করে “হতবাক হতচ্ছাড়া” ছদ্মনামে। তার লেখালেখির বিষয় মূলত মুক্তিযুদ্ধ। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার পড়াশোনাও অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি। একারণেই মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে সে যখন কিছু বলতে শুধু করে, তখন সবাই তাকে নিয়ে টিটকারি মারলেও তার কথার পিঠে কোনো কথা কেউ বলতে পারে না কিংবা তার বিরোধিতা করতে পারে না। বলবে কী করে? এই বিষয়ে ক্লাসের ৯৬% ছাত্রছাত্রীর জ্ঞানই প্রায় শূন্যের কাছাকাছি!

স্যার হ্যা বা না কিছুই বললেন না, তবুও আবীর বলতে শুরু করল, “স্যার, লেখকরা তাদের লেখনীর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানীদের প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশ করেন, সেটা একাত্তরের তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রাপ্য। বরং এর চাইতে বেশিই প্রাপ্য। আর যে বিষয়টাকে আপনি সামান্য ‘পলিটিক্যাল ম্যাটার’ বলে তুচ্ছজ্ঞান করছেন, সেটা কিন্তু কোন যেন তেন পলিটিক্যাল ম্যাটার না স্যার। সেটা আমাদের জন্ম ইতিহাস। একটা শিশুর জন্য যেমন তার জন্মপরিচয় জানাটা জরুরি, তেমনি একটি জাতির জন্যেও জরুরি তার জন্ম ইতিহাস জানা।”

স্যার রেগে গিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শেষ মুহুর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে বললেন, “ঠিক আছে, মেনে নিলাম। মেনে নিলাম যে মুক্তিযুদ্ধ কোন পলিটিক্যাল ম্যাটার না। কিন্তু তাই বলে একটা পুরনো বিষয়কে আকড়ে ধরে রেখে আর কতদিন চলবে? তাছাড়া পাকিস্তানীরা

মুসলিম। সেই কবে একাত্তর সালে কী হয়েছিল না হয়েছিল, তার জন্য তুমি একজন মুসলিম হয়েও পাকিস্তানীদের প্রতি ঘৃণা পুষে রাখবে? তাও আবার এই ২০২৬ সালে এসে?"

"আমি আবারও বলছি স্যার," আবীর তার ঠোটের কোণে এক চিলতে হাসি ধরে রেখে বলতে শুরু করল, "একটা শিশুর জন্য যেমন তার জন্মপরিচয় জানাটা জরুরী, তেমনি একটি জাতির জন্যও জরুরী তার সঠিক জন্ম ইতিহাস জানা। শিশুটি যদিও বা বড় হয়ে যায়, তবুও তার জন্মপরিচয়ের প্রয়োজন কিন্তু ফুরায় না; বরং তখন তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। তেমনি একটি জাতির স্বাধীনতার ইতিহাস যতই পুরনো হোক না কেন তা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ।" একটু থেমে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল আবীর, সহপাঠীদের সমর্থন পাবার আশায়; কিন্তু তাকে সমর্থন করবার মত পুরো ক্লাসে কাউকেই দেখা গেল না। তাতে অবশ্য সে দমে গেল না। সে আবারও বলতে শুরু করল, "আর পাকিস্তানীরা হতে পারে মুসলিম, কিন্তু তাই বলে তো এটা ভুলে যাওয়া যাবে না যে একাত্তরে ওরা আমাদের দেশের সাথে কী করেছে! একজন সন্তান কী তার মায়ের ধর্ষকদের ক্ষমা করে দেবে শুধুমাত্র এই কারণে যে ধর্ষকদের নামের আগে মোহাম্মদ কিংবা নামের শেষে খান আছে?"
"কীরে? তোর মায়রেও কী ধর্ষণ করছিল নাকি?!"

পেছনের সারি থেকে কেউ একজন টিটকারির সুরে বলে উঠলো কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে পুরো ক্লাসে একটা হাসির রোল পড়ে গেল। কিন্তু রায়হান স্যারের এক ধমকেই সবার হাসি থেমে গেল।
"খবরদার! এক্কেবারে মাথা ভেঙে ফেলব শব্দ করলে!"

ধমক খেয়ে সবাই চুপ করে গেলে কারও মুখ থেকেই হাসি এত সহজে মুছে গেল না, সবাই মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। আবীর একবার ক্লাসের সবার ওপর দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে আনল, তারপর বলল, "এডলফ হিটলারের নাৎসী প্রোপাগান্ডা মন্ত্রী

যোসেফ গোয়েবলস বলেছিলেন, ‘একটা জাতিকে ধ্বংস করতে হলে শুধুমাত্র তার ইতিহাস জ্ঞান বিকৃত করে দাও’। বলতেই হচ্ছে স্যার, স্বাধীনতা বিরোধীরা আজ অনেকাংশেই সফল!”

“বোকার মত কথা বোলো না!” স্যারের মুখে বিরক্তির ছাপ আরও অনেকটা বেড়ে গেল। তিনি মেঘস্বরে বললেন, “কী দেখে তুমি বলছো যে স্বাধীনতা বিরোধীরা সফল?! দেশ, জাতি তো যেমন ছিল তেমনি আছে! তাহলে?”

জবাবে আবীর কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলেন রায়হান স্যার। বললেন, “ইতিহাস জ্ঞান না থাকলেই যদি একটা জাতি ধ্বংস হয়ে যেত, তাহলে এই পৃথিবীতে হাতে গোণা ক’টা জাতি টিকে থাকত মাত্র! পৃথিবীতে তো এমন অনেক জাতি আছে, যারা উন্নতি করতে করতে রীতিমত আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে; অথচ তাদের ইতিহাস আমরা কয়জন জানি?”

“স্যার, তাদের ইতিহাস আমরা না জানতে পারি,” স্যারের তীক্ষ্ম চাহনিকে উপেক্ষা করে আবারও বলতে শুরু করল আবীর, “কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে ঠিকই সচেতন। তারা সচেতন বলেই.....”

“ব্যস!” স্যার হাত তুলে থামিয়ে দিলেন আবীরকে। তারপর চোখ সরু করে আবীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “অনেক হয়েছে! এই আলোচনা এখানেই শেষ। বোসো এবার।”

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসে পড়ল আবীর। সে কিছুতেই ভেবে পেল না, একটা জাতি কী করে এতটা ইতিহাস বিমুখ হতে পারে? কী করে পারে ইতিহাস সম্পর্কে এতটা উদাসীন হতে?! তাও আবার নিজেদের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে! হতাশ ভঙ্গিতে নিজের কপাল চাপড়ালো সে।

“এই আবীর! দ্যাখ ইমরান তোকে কী যেন দিয়েছে।”

পেছনের বেঞ্চ থেকে একজনের ডাক শুনে একটু অবাক হয়েই ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকাল আবীর। দেখলো, পেছনের বেঞ্চে বসা একজন একটা ভাজ করা কাগজ ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে আছে। আর তার দুই বেঞ্চ পেছনে বসে ইমরান আবীরের দিকে তাকিয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসছে।

ইমরানের মত বাঁদর গোছের ছেলে বোধহয় পুরো কলেজেও দ্বিতীয়টা নেই! সে কখনো কাউকে কিছু দিতে জানে না, বরং একেকজনের কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস হাতিয়ে নেওয়ায় সে সিদ্ধহস্ত।আর যদিও বা কাউকে কিছু দেয়, তার পেছনে অবশ্যই কোন না কোন বদ মতলব থাকবেই! আর একারণেই ইমরানের দেয়া চিরকুটটা নেওয়া ঠিক হবে কি হবে না, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল আবীর।

এক পর্যায়ে অবশ্য কৌতুহলের কাছে তার সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হেরে গেল, হাত বাড়িয়ে চিরকুটটা ধরল সে। তারপর ভাঁজ খুলে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরল সে চিরকুটটা। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তার! কারণ চিরকুটটাতে লেখা-
“ইঞ্জেকশনের নেক্সট ডোজ কবে?”

প্রমাদ গুণল আবীর। ইঞ্জেকশনের কথা তো কারো জানার কথা না! তাহলে এটা জানাজানি হল কীভাবে?! আবীর পেছন ফিরে ইমরানের দিকে তাকাল, ইমরানের মুখে শয়তানি হাসি আরও বিস্তৃত হয়েছে। আজ পর্যন্ত ইমরান যখনই কারো সম্পর্কে কোন গোপন তথ্য জানতে পেরেছে, তখনই তার জীবন অতীষ্ঠ করে ছেড়েছে। কে জানে আবীরের এই ব্যাপারটা নিয়ে সে কী কী করবে!

****

"যত যা-ই বলিস," আবীরের পাশ দিয়ে হাটতে হাটতে বলল সাদিব, "স্যারের সাথে ওরকম বেয়াদবি করা তোর উচিত হয় নি।"

সাদিবের কথা শুনে তার দিকে তাকাল আবীর। সে বুঝতে পারছে না যে সাদিব তার কোন আচরণটাকে "বেয়াদবি" বলে মনে করছে। আবীর বুঝতে পারছে না ভেবেই বোধহয় সাদিব আবারও বলল, "এই যে তুই প্রায়ই ক্লাসে টীচারদের সাথে নানান বিষয় নিয়ে তর্ক জুড়ে দিস, তাদের কথায় ভুল খুজে বেড়াস; এর জন্য আজ পর্যন্ত অনেকবার তোর বাসায় কমপ্লেইনও গেছে। তাহলে কেন করিস এরকম?"

"আমার জানা ছিল না যে সত্যি কথা বলাটা এক ধরনের বেয়াদবি।" একটা দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে বলল আবীর।

"সত্যি কথা বলা বেয়াদবি না।" জবাবে সাদিব বলল, "কিন্তু অযথা গুরুজনদের মুখে মুখে তর্ক করাটা বেয়াদবি। আজকে রায়হান স্যারের ক্লাসে কী দরকার ছিল স্যারের মুখে মুখে ওভাবে তর্ক করার? তাছাড়া স্যারের তো আর না জেনেশুনে কিছু বলার কথা না।"

গম্ভীর মুখে আবীর বলল, "এতক্ষণ পর্যন্ত তো আমার মনে হচ্ছিল স্যার না জেনে ভুল করছেন। কিন্তু তোর কথা মেনে নিলে তো দেখা যায় যে স্যার জেনে বুঝেই ভুল করছেন!"

সাদিব হাল ছেড়ে দিল। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য সে বলল, "বাদ দে। আচ্ছা, একটা কথা বল তো! এই যে তুই কথায় কথায় বলিস যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে, আমরা ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন, আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানি না; কিন্তু কই? আমরা তো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানিই!"
"কী জানিস বল তো শুনি।" বলল আবীর।

সাদিব বলতে শুরু করল, “জানি যে উনিশ শ’ একাত্তর সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি মিলিটারীরা গণহত্যা চালায়, এরপর ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাঙালিরা যুদ্ধ শুরু করে এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। আর প্রায় নয় মাসের এই গণ্ডগোলে প্রায় দুই-তিন লক্ষ লোক নিহত আর কিছু নারী ধর্ষিত হয়েছিল। ব্যস।”
“ব্যস?!” চোখ কপালে তুলে বলল আবীর, “এই তোর ইতিহাস জ্ঞান?”
“কেন? ভুল কী বললাম?” বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল সাদিব।

“যেই যুদ্ধের বীজ বপন শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সাল থেকে, সেই যুদ্ধ সম্পর্কে তুই শুধু এটুকুই জানিস যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ, আর শেষ হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর?” ধিক্কারের সুরে বলল আবীর। নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য একটু থেমে তারপর আবার বলল, “আর তুই এই তথ্য কোথায় পেলি যে একাত্তরে মাত্র দুই তিন লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে? কিছুদিন আগেও তো আমি তোর সামনেই বললাম, ‘বাংলাদেশ কারও দয়ার দান না, ত্রিশ লক্ষ প্রাণ আর দু’ লক্ষ সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাওয়া এই দেশ!’ এরই মধ্যে ভুলে গেলি?”

“দেখ ভাই, আমি যা জানি তাই বলেছি, এর বেশি জানার আমার কোন দরকার নেই।” সাদিবের কণ্ঠে বিরক্তি ঝরে পড়ল, “আর তাছাড়া এইসব রাজনীতি ফাজনীতি আমার ভাল লাগে না!”

রেগে মেগে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল আবীর, কিন্তু হঠাৎ একটা ফিসফিসানির শব্দ শুনে থমকে দাড়ালো সে। তাকে দাড়িয়ে যেতে দেখে সাদিবও দাড়িয়ে গেল। তারা এখন দাড়িয়ে আছে বাংলা বিভাগের অফিস রুমের সামনে, ফিসফিস করে কথা বলার শব্দ ওখান থেকেই আসছে। দরজাটা ভেরানো থাকায় বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না যে ভেতরে কে আছে, কে-ই বা ফিস ফিস করে কথা বলছে এভাবে রুমের দরজা বন্ধ করে। আবীর ভাবলো, কে আর হবে? বাংলা বিভাগের প্রধান রায়হান

স্যার, সে-ই হবে হয়ত। কিন্তু তিনি এভাবে ফিস ফিস করে কথা বলছেন কেন? কার সাথেই বা কথা বলছেন?
“কী হল?” কৌতুহলী গলায় জিজ্ঞেস করল সাদিব।
“এক কাজ কর,” গলা নামিয়ে বলল আবীর, “তুই এগোতে থাক। আমি আসছি।”
কাঁধ নেড়ে সায় জানালো সাদিব। তারপর দ্রুত পায়ে হাটা ধরল। আবীরের লেকচারের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে!

দরজায় কান পাতলো আবীর। শুনতে পেল ফিস ফিস করে একজন বলছে, “আপনি ভাবতেও পারবেন না, এই কলেজের লোকেশনটা আমাদের কাজের জন্য কতটা পারফেক্ট! এখান থেকেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।..... হ্যা, কলেজটা রাজধানী শহরের মাঝখানে একটা অখ্যাত কলেজ, কিন্তু পারফেক্ট লোকেশন!...... না.... হুম..... হ্যা, প্রজেক্ট পাইয়ের জন্য আমাদের এখানে সবকিছুই রেডী। প্রয়োজনীয় সবকিছুরই বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, এখন শুধু এফিব্যানের আসার অপেক্ষা!”

কথাগুলো খুবই দূর্বোধ্য ঠেকলো আবীরের কাছে। দ্বিতীয় কারো কথা শোনা গেল না, তারমানে স্যার ফোনে কথা বলছিলেন। কে থাকতে পারে ফোনের অপর প্রান্তে? আর এই দূর্বোধ্য শব্দগুলোরই বা কী অর্থ হতে পারে?

ভেতর থেকে চেয়ার সরানোর শব্দ ভেসে এল, স্যার চেয়ার সরিয়ে উঠে দাড়িয়েছেন। এক্ষুণি হয়ত হেটে দরজার কাছে চলে আসবেন, তারপর দরজা খুলবেন। দরজা খুলেই যদি দেখেন যে আবীর এখানে দরজায় কান পেতে দাড়িয়ে আছে, তাহলে মহা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে! আবীর দ্রুত হাটা ধরল। হটতে হাটতে সে এক সময় দূর্বোধ্য সেই শব্দগুলোর কথা বেমালুম ভুলে গেল।

তবে আবীর এখনো জানে না, এই শব্দগুলোর কথা খুব শীঘ্রই তাকে স্মরণ করতে হবে।

৩.

-ফাইজান খান।

-আপনার সেবায় সর্বদা হাজির মাস্টার ক্রুগো।

-তুমি কী তোমার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছ?

-সে বিষয়ে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই মাস্টার ক্রুগো। আপনি শুধু দেখতে থাকুন।

-ভুলে যেয়ো না ফাইজান, আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে নয় মাসের যুদ্ধে এই জাতিই তোমাদের হারিয়ে দিয়েছিল।

-ভুলি নি মাস্টার ক্রুগো। আমাদের সব মনে আছে!

-তারপরেও এই জাতিকে এত তুচ্ছভাবে নিচ্ছ?

-জ্বী মাস্টার ক্রুগো। তুচ্ছভাবে নিচ্ছি এই কারণে যে, এই জাতি এখন আর তাদের পঞ্চান্ন বছর আগের অবস্থায় নেই।

-কী রকম?

-ওদের মেরুদণ্ড আমরা চিরতরে ভেঙে দিয়েছি মাস্টার ক্রুগো! এখন আমরা ওদের চোখের সামনে দিয়ে ওদের দেশ দখলে নিয়ে নেব, আর ওদের কিচ্ছু করার থাকবে না!

-সেটা কীভাবে?

-তার রাস্তা তো আমাদের পূর্বপুরুষরাই আমাদের জন্য সুগম করে দিয়ে গেছেন। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন তারা বুঝতে পারলেন যে এই জাতির কাছে তাদের পরাজয় নিশ্চিত, তখন থেকেই তারা পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর সেই প্রস্তুতির প্রথম অংশ ছিল দেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা, যার ফলস্বরূপ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সে দেশে দেখা দেয় মেধার ঘাটতি!

-কিন্তু তারমানে তো আর এই নয় যে এর পরে সেই দেশে আর কোন বুদ্ধিজীবীর জন্ম হয় নি।

-জন্ম হয়েছে মাস্টার ক্রুগো, অনেক বুদ্ধিজীবীর জন্ম হয়েছে। কিন্তু সেটা হতে যে অনেক দেরি হয়ে গেছে, ঐ দেশে বসবাসকারী আমাদের চরেরা ততদিনে তাদের কাজ করে ফেলেছে! তারা ওখানকার কচি মাথাগুলোতে আমাদের মন্ত্র ঢুকিয়ে এমন এক ফৌজ তৈরি করেছে, যারা কিনা বুদ্ধিজীবীদের মুখ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে একটা শব্দ বের হওয়া মাত্রই তাদের গর্দান নামিয়ে দিতে প্রস্তুত!

-বাহ! চমৎকার!

-আর যাদের মাথায় আমাদের মন্ত্র ঢোকানো সম্ভব হয় নি, তাদের মাথায় ঢোকানো হয়েছে অন্য এক মন্ত্র- I hate Politics! আর এই কাজটা করেছে আমাদের সেই চরেরা, যারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত আছে।

-এতে লাভ?

-লাভ আছে মাস্টার ক্রুগো! এর মাধ্যমে কচি ছাত্রছাত্রীদের মনে "রাজনীতি" নামক বিষয়টার প্রতি একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলে তারা রাজনীতির নাম থেকেও দূরে সরে থাকে! তাই এক দিকে যেমন তাদের ভেতরে রাজনৈতিক সচেতনতা বলে কিছু নেই, আরেক দিকে তেমনি দেশের বর্তমান রাজনীতিতে কোন শিক্ষিত মাথা নেই।

-চমৎকার!

-তবে আর বলছি কী মাস্টার ক্রুগো? এখন শুধু রাজনীতি না, ইতিহাস সম্পর্কেও ওরা উদাসীন! '১৯৭১' এখন ওদের কাছে শুধু চার অঙ্কের একটা সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই না!

-তাই নাকি?

-জ্বী মাস্টার ক্রুগো। ঐ দেশে ঢুকতে আমাদের আর কোন বাধা নেই। এখন আমরা যেকোন সময় আমাদের ভাইরাস ঐ দেশে ছেড়ে দিতে পারি!

-মূল পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন হবে না। এ্যাটাক হবে সবকটা দেশে একসাথে।

-আপনি যা হুকুম করেন মাস্টার ক্রুগো।

-তাহলে তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও, কারণ সেই শুভ মুহূর্ত আসতে আর বেশিদিন দেরি নেই। আর হ্যা, এই মিশনে যদি তোমরা সফল হতে পারো তবে আমি কথা দিচ্ছি, ঐ দেশের সম্পূর্ণ শাসনভার তোমাদের হাতে থাকবে।

-আপনি আমাদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন মাস্টার ক্রুগো। আমরা সফল হবই, ইনশাআল্লাহ!

-আর যদি সফল না হতে পারো, তবে তার ফল তো তোমার জানাই আছে।

-জ্বী মাস্টার ক্রুগো, আমি জানি।

-একটা মিশন সফল হলেই কেবল তোমরা পরবর্তী মিশনের জন্য বেঁচে থাকবে। নতুবা....

৪.

“আবীর।”

রাজ্জাক স্যারের ডাক শুনে থেমে দাড়ালো আবীর। দেখলো রাজ্জাক স্যার রসায়ন ল্যাবের দরজায় দাড়িয়ে আছেন। দু’হাত আড়াআড়ি ভাবে বুকের ওপর রেখে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন আবীরের দিকে। আবীর তার দিকে তাকানোর পর তিনি শীতল গলায় বললেন, “ভেতরে এসো।” বলেই ল্যাবের ভেতরে ঢুকে গেলেন রাজ্জাক স্যার, তার পেছন পেছন ঢুকলো আবীরও।

প্রফেসর জাওয়াদ বিন রাজ্জাক, রসায়নের অধ্যাপক। খুবই রাশভারী একজন ব্যক্তি, সর্বশেষ কবে তাকে হাসতে দেখা গেছে তা স্বয়ং উপরওয়ালাই জানেন! তবে ক্লাসে অনেক ভালো পড়ান। কখনো কখনো ছাত্ররা অবাক হয়ে ভাবে, এমন একটা অখ্যাত কলেজে তিনি কী মনে করে পড়ে আছেন?!

রাজ্জাক স্যার তার চেয়ারে বসলেন, তারপর আবীরকে ইশারা করলেন টেবিলের অপর পাশের চেয়ারটিতে বসবার জন্য। আবীর বসলো। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো রাজ্জাক স্যারের দিকে।

“আবীর,” একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর বললেন রাজ্জাক স্যার, “তুমি কী জানো আমি তোমাকে কেন ডেকেছি?”

আবীর “না” সূচক মাথা নাড়লো।

“গতকাল বাংলা ডিপার্টমেন্টে বসে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললাম রায়হান স্যারের সাথে।” রাজ্জাক স্যার বলতে লাগলেন, “কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে তোমার প্রসঙ্গ উঠে এল। এবং তোমার আচরণ সম্পর্কে রায়হান স্যার যা বললেন, তা শুনে

তো আমি তাজ্জব বনে গেলাম! তোমার সম্পর্কে কখনও এরকম কিছু শুনব বলে আমি আশা করি নি আবীর।”
আবীর কোন জবাব দিল না, চুপ করে বসে রইলো।

রাজ্জাক স্যার আবার বললেন, “তুমি একটা ভাল পরিবারের ছেলে, তোমার বাবা-মা দু’জনই শিক্ষিত; তোমার পক্ষে অন্তত এরকম আচরণ শোভা পায় না। আমার সাথে তোমার ভাল চেনাজানা আছে জেনেই রায়হান স্যার প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে না গিয়ে পুরো ব্যাপারটা আমাকে জানিয়েছেন।তোমার এই বেয়াদবির কথা প্রিন্সিপাল স্যারের কান পর্যন্ত গড়ালে কী হত তুমি জানো?!”
এবারেও কোন জবাব দিল না আবীর। আগের মতই চুপচাপ বসে রইলো, যেন স্যার এরপর কী বলবেন সেই অপেক্ষায় আছে।
“যাই হোক, আশা করি ভবিষ্যতে তুমি আর এরকম আচরণ করবে না।” আবীরের উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর রাজ্জাক স্যার বললেন, “তুমি ছাত্র মানুষ, এখন তোমার রাজনীতি নিয়ে ভাববার বয়স নয়। এইসব যুদ্ধ টুদ্ধ নিয়ে এই বয়সে না ভাবলেও চলবে।”
“চলবে না স্যার।” রাজ্জাক স্যারকে অবাক করে দিয়ে আবীর, “কারণ মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, দেশ- এসব নিয়ে ভাববার সময় এখনই। আর যদি আমরা না ভাবি, তাহলে তার সুযোগ নিয়ে নেবে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি!”

রাজ্জাক স্যার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আবীরের দিকে। মানুষের চোখ থেকে আগুন বের হওয়ার ব্যবস্থা থাকলে আবীর হয়ত এতক্ষণে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেত! কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রাজ্জাক স্যার বললেন, “দেখো আবীর, তোমার যত বছর বয়স, তত বছর ধরে আমি শিক্ষকতা পেশায় আছি। এই বয়সে এসেও আমি কোন পক্ষ-বিপক্ষে নেই, আর তুমি কিনা আমারই ছাত্র হয়ে এইসব পক্ষ-বিপক্ষের পলিটিক্সে জড়িয়ে গেছ?”
আবীর মাথা নিচু করে বলল, “তাহলে আপনিই বলুন স্যার, আমি কী করব?”

“নিরপেক্ষতা বলে কোন শব্দ কী তোমার জানা নেই?” রাজ্জাক স্যার বললেন, “নিরপেক্ষ থাক। যেকোন এক দিকে না গিয়ে দুই দিক বিচার করো, আর নাহয় কোন দিকেই যাবার দরকার নেই।”

আবীর একটু সময় নিয়ে কিছু একটা ভাবলো, তারপর জিজ্ঞেস করল, “আপনার কী একটু সময় হবে স্যার? তাহলে কিছু কথা বলতাম।”

“বলো।” রাজ্জাক স্যার আবীরের অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গি দেখে কিছুটা অবাকই হলেন, তবুও অনুমতি দিলেন। তার মনে কৌতুহল, হঠাৎ কী এমন কথা বলার জন্যে এভাবে সময় চাইছে ছেলেটা?

আবীর বলতে শুরু করল, “স্যার, বছর পাঁচেক আগে একদিন বাসায় খবর এলো, আমাদের দাদী নাকি খুব অসুস্থ, যেকোন সময় মারা যেতে পারেন। আমরা শেষবারের মত একবার তাকে দেখব বলে ছুটে গেলাম গ্রামের বাড়ি। আমরা গিয়ে পৌছানোর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দাদী মারা যান। মত্যুকালে তার বয়স ছিল পচানব্বই বছর। যখন তার মৃতদেহের কাছে গেলাম, দেখলাম তিনি দু’হাতে শক্ত করে একটা খয়েরী রঙের পুরনো, ছেড়া, ময়লা শার্ট বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন। শার্টটিতে ছিল শুকিয়ে যাওয়া কালচে রক্তের ছোঁপ! শার্টটি তার বড় ছেলের।”

আবীর থামলো একটু নিঃশ্বাস নেবার জন্যে। রাজ্জাক স্যার কোন কথা বললেন না, আবীর কী বলে তা শোনার অপেক্ষায় রইলেন।

আবীর আবার বলতে শুরু করল, “একাত্তরে আমার বাবার বয়স ছিল ১৪ বছর, আর আমার বড় চাচার বয়স ছিল ১৯ বছর। আমার দাদা যুদ্ধের মধ্যেই হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। এরকম অবস্থায় দাদীর অন্ধের যষ্ঠী দুই ছেলে যখন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বায়না ধরলেন, দাদী তাদের বাঁধা দিলেন না, বরং দেশের জন্য তার দুই ছেলেকে বিসর্জন দিয়ে দিলেন। এর কয়েকদিনের মধ্যেই দাদীর কাছে খবর এলো, বড়চাচা মিলিটারীদের হাতে ধরা পড়েছেন, আর বাবার গায়ে গুলি লেগেছে! বড়চাচাকে নাকি ক্যান্টনমেন্টে চালান করে দেওয়া হয়েছে এর মধ্যেই। দাদী ছুটে

গেলেন মিলিটারীদের কাছে বড়চাচার প্রাণ ভিক্ষা চাইতে; মায়ের মন তো! কিন্তু প্রাণ ভিক্ষা তো দূরে থাক, বড়চাচার সাথে দেখাই করতে দেয়া হল না তাকে। তিনি খালি হাতে ফিরলেন। এর কয়েকদিনের মধ্যেই দাদী আবার খবর পেলেন, কাছেই একটা জংলামতন জায়গায় মিলিটারীরা অনেকগুলো লাশ ফেলে দিয়ে গেছে। দাদী ছুটে গেলেন সেখানে, বড়চাচাকে খুজতে। কিন্তু খুজে পাওয়া কী আর এত সহজ? সবকটা লাশেরই চেহারা বিকৃত; কারো চোখ খুবলে নিয়েছে, কারো মুখ তুবড়ে দিয়েছে, কারো কারো তো ধরের ওপর মাথাই নেই! দেহগুলোর অবস্থা দেখার মত ছিল না। তার মাঝেও দাদী তার ছেলেকে খুজতে নেমে পড়লেন। ছেলেকে তো পেলেন না, কিন্তু হঠাৎ করেই যেন পেয়ে গেলেন তার ছেলের প্রিয় খয়েরী রঙের শার্টটা! সেটার জায়গায় জায়গায় লেগে ছিল রক্ত, খানিকটা মাংসের টুকরো, আর টুকরো টুকরো মগজ!”

আবীর আবার থামলো, তার গলা ধরে এসেছে। রাজ্জাক স্যার এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তার দিকে, সে এরপর কী বলে তা শোনার অপেক্ষায়। আবীর আবার বলা শুরু করল, “যুদ্ধ শেষে হল। বাবা আহত অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন ছয় মাস। ছয় মাস পর যখন বাবা বাড়ি ফিরলেন, তখন দাদী পুরোপুরি একজন মানসিক ভারসাম্যহীন একটা মানুষে পরিণত হয়েছেন! তিনি সারাদিন তার ছেলের সেই শার্টটা বুকে জড়িয়ে ধরে রাখেন, আর প্রলাপ বকতে থাকেন। দাদীর এই অবস্থা দেখে বাবা ভাবলেন, হয়তবা বাকি জীবনটা তার মায়ের সেবা করে কাটাবার জন্যেই ঈশ্বর তাকে জীবিত রেখছেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি কখনও বিয়ে করবেন না। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে করেন নি তিনি। কিন্তু এরপরে আত্মীয় স্বজনেরা এক রকম জোর করেই তাকে বিয়ে করিয়ে দিল।”

আবীর থামলো। যদও়ি এখানেই কাহিনীর সমাপ্তি না, কিন্ত তবুও আবীর সমাপ্তি টানলো। তার পক্ষে আর বলা সম্ভব না, গলা ধরে এসেছে তার। সে রাজ্জাক স্যারের

দিকে তাকালো। স্যার মুখে কিছু না বললেও তার প্রশ্নবোধক চাহনি দেখেই আবীর বুঝলো, স্যার ঠিক বুঝতে পারছেন না যে আবীর তাকে কেন এই ঘটনা শোনালো।
“এখন আপনিই বলুন স্যার,” আবীর তার গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল, “যার পরিবারের সাথে ‘একাত্তর’ এতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, সে কীভাবে পারে একাত্তর প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ থাকতে?”

রাজ্জাক স্যার কিছুক্ষণ আবীরের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবলেন। তার গম্ভীর মুখ দেখে আবীর অনুমান করতে পারল না যে স্যার কী ভাবছেন, তাই সে অপেক্ষা করতে লাগল স্যারের উত্তরের জন্য। কিন্তু স্যারের উত্তর তাকে হতাশ করে ছাড়ল!
“আবীর, তুমি এখন আসতে পারো।”
বাধ্য ছেলের মত উঠে দাড়ালো আবীর। সে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কী কারণে যেন রাজ্জাক স্যার আবার ডেকে থামালেন তাকে।
“আবীর, তোমার পেছনে ওটা কী?”
“কোনটা স্যার?” আবীর রাজ্জাক স্যারের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল।
“একটু এদিকে এসো তো দেখি।” স্যার ডাকলেন আবীরকে।

আবীর দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, স্যার ডাকায় আবার ফিরে এলো। স্যারের টেবিলের পাশ কাটিয়ে তার চেয়ারের পাশে গিয়ে দাড়ালো আবীর। রাজ্জাক স্যার আবীরের পেছনে হাত দিয়ে তার পিঠে স্কচ টেপ দিয়ে লাগানো একটা এ-ফোর সাইজের কাগজ খুলে আনলেন। কাগজটিতে লেখা- “আমি ইঞ্জেকশন নিয়েছি, আপনি নিয়েছেন তো?” রাগে দিশেহারা হয়ে পড়ার মত অবস্থা হল আবীরের! ক্লাস থেকে বের হওয়ার সময় ভিড়ের মধ্য থেকে ইমরান তার পিঠে একটা থাবা মেরেছিল; তারপর যখন সে ক্লাস থেকে বের হল তখন দেখে সবাই পেছন থেকে তার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছে। তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি, কিন্তু এখন ঠিকই বুঝতে পারছে।

“ইঞ্জেকশনের ব্যাপারটা কী?” রাজ্জাক স্যার সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন আবীরের দিকে, জিজ্ঞেস করলেন, “কী ইঞ্জেকশন?”

আবীর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, “টেস্টানন ২৫০। টেস্টোস্টেরন হরমোনের ঘাটতির জন্য এই ইঞ্জেকশন।” রাজ্জাক স্যার আরও কিছু জিজ্ঞেস করবেন ভেবে আবীর কিছুক্ষণ দাড়িয়ে রইলো চুপচাপ, কিন্তু স্যার কিছু বলছেন না দেখে সে বলল, “স্যার, আমি কী এখন আসতে পারি?”

স্যার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, আবীরের ডাকে তিনি বাস্তবে ফিরে এলেন। তারপর ‘যা ভেবেছিলাম তা নয়’ ধরনের একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, “হ্যা। এবার তুমি আসতে পরো!”

রসায়ন ল্যাব থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আবীর ভাবলো, স্যার আসলে কী সন্দেহ করেছেন? স্যার কী ভেবেছেন আবীর নেশা করে?

৫.

-আসসালামু আলাইকুম, হুজুর।

-ওয়ালাইকুম আসসালাম। সোলায়মান, তোমাদের ওদিককার খবর বল।

-হুজুর, আমাদের এইখানে সবকিছু রেডি, সবকিছুরই ইন্তেজাম হইয়া গেছে। এখন খালি আপনাদের আসার অপেক্ষা!

-আর প্রফেসর? তার কী খবর?

-প্রফেসরের কামই তো আসল, তার কাম ঠিকঠাক হইলেই তো সবকিছু ঠিক ঠাক! প্রফেসর, আমি, আমরা সবাই-ই তো সবকিছু রেডি কইরা এহন আপনার আসার অপেক্ষায় আছি হুজুর!

-গুড! আমাদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হতে চলেছে। সেই শুভ মুহুর্ত আসতে আর বেশি দেরি নেই, যার জন্য আমরা এত বছর ধরে অপেক্ষা করে আসছি!

-সুবহানাল্লাহ!

-সোলায়মান।

-জ্বী হুজুর।

-এবারে ঊর্দু শিখে ফেলো। ওখানে এসে যেন আমাকে তোমাদের মুখে বাংলা শুনতে না হয়!

-হে হে। হুজুর, আমরা তো বাংলা বলতে চাই না, ঠেকায় পইড়া বলি। ঊর্দু হইলো আমাদের ভাষা, মোসলমানদের ভাষা। এই ভাষা মুখে বলতে না পারার দুঃখ কেমনে বুঝাই, বলেন হুজুর?!

-এবার থেকে আর বাংলা কোন শব্দ শোনা যাবে না, সবাই এবার ঊর্দু বলবে। বলতে তাদের হবেই!

-ইনশাআল্লাহ!

-সবাই তাই বলবে, যা আমরা শুনতে চাইব। আর করবেও তাই, যা আমরা করতে বলব। পঞ্চান্ন বছর পর প্রতিশোধ নেয়ার যে সুযোগ আমরা হাতে পেয়েছি, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার আমরা করব!

৬.

আবীর আজ কলেজে যায় নি, তার শরীরটা ভাল লাগছে না। তাই সে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে খালি গায়ে বিছানায় শুয়ে আছে। বেলা বারটা বাজে, এখন ঘুমাবার সময় নয়; কিন্তু আবীরের খুব ঘুম পাচ্ছে।
"টিভির রিমোটটা কোথায়?"

নিচ তলায় ড্রয়িং রুম থেকে বাবার গলার স্বর ভেসে এলো, খানিকটা বিরক্ত মনে হচ্ছে। প্রফেসর সাইফুল আযম, আবীরের বাবা। আবীর যেই কলেজে পড়ে, সেই কলেজেরই প্রিন্সিপাল ছিলেন। চার বছর হল চাকরি থেকে রিটায়ার্ড করেছেন।
"রূপা তো কিছুক্ষণ আগে টিভি দেখছিলো, ওকে জিজ্ঞেস করো।" উত্তরে মা বললেন। ইয়াসমিন চৌধুরী, আবীরের মা। পেশা শিক্ষকতা।
"রিমোট তো সোফার ওপরেই রেখেছিলাম।" রূপার কণ্ঠ শোনা গেল, "ওখানেই আছে দেখো।"
রূপা, আবীরের বড় বোন। স্নাতক পরীক্ষার্থী।
"পেয়েছি।" বাবার কণ্ঠ শোনা গেল।

টিভি অন হল। ভেসে এলো এক মহিলার কানের পর্দা ফাটানো গগনবিদারী চিৎকার! চিৎকার ঠিক না, ওটা গান ছিল। একটা সময় ছিল যখন ইংলিশ গানের কথা কিছু বোঝা যেত না; আর এখন বাংলা গানের কথাও বোঝা যায় না। ২০২৬ সালে নাকি এই গানই চলে!

চ্যানেল বদল হল। শোনা গেল খবর পাঠিকা খবর পড়ছে, উচ্চারণ শুনে বোঝা যাচ্ছে কোন ভারতীয় বাংলা চ্যানেলের খবর। খবর পাঠিকা পড়ে যাচ্ছে, "আজ রাজধানী

দিল্লীর চারটি জায়গায় রহস্যজনক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, এবং চারটি বিস্ফোরণ একই সময়েই ঘটেছে। আর সবচাইতে অদ্ভুত ব্যাপার হল এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটে নি, কেবল এক ধরনের দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস নির্গত হচ্ছে। আর এই গ্যাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। বিস্তারিত জানাচ্ছেন....।"

আবারও চ্যানেল বদল হল। বেশ কয়েকবার চ্যানেল বদলানো হল। বোঝা যাচ্ছে যে বাবা বাংলাদেশের খবর খুজছেন। আরো কয়েকবার চ্যানেল বদলানোর পর বাবা একটা চ্যানেলে এসে থামলেন। তারপর ভলিউম বাড়ালেন। শোনা গেল একজন লোক খবর পড়ছেন, "আমি মারজান ইভান, প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম।" একের পর এক সংবাদ শিরোনাম বলে গেলেন মারজান ইভান নামে লোকটি- ঢাকার তিন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ: চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস; দেশের বিভিন্ন জায়গায় অজানা কারণে নাশকতা চালাচ্ছে বিক্ষুব্ধ জনতা: তাদের এই বিক্ষোভের কারণ জানতে জোর তদন্ত চলছে ইত্যাদি। শিরোনামগুলো শুনে ভ্রু কোচকালো আবীর। হচ্ছেটা কী আসলে?! সংবাদ শিরোনাম শেষ করে বিস্তারিত খবর পড়তে শুরু করলেন মারজান ইভান, "এইমাত্র জানা গেছে, রাজধানী ঢাকার তিন জায়গায় একযোগে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রহস্যময় এ বিস্ফোরণের ফলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস! বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার মুজিবুল ইসলাম।"

একটু খটকা লাগলো আবীরের। কিছুক্ষণ আগে ভারতীয় চ্যানেলের খবরেও একই রকম খবর শুনেছে সে। বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো আবীর। তারপর বিছানা থেকে নেমে পাশের চেয়ারে ঝোলানো গেঞ্জীটা পড়ে নিয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার ঘরের দরজার পাশেই নীচতলায় যাবার সিড়ি। সিড়ি বেয়ে নীচে নামলো সে। তারপর বাবা যে সোফায় বসা সেই সোফাটির পেছনে এসে দাড়িয়ে টিভি পর্দার দিকে তাকালো।

টিভি পর্দায় দেখা যাচ্ছে একজন রিপোর্টারকে মুখে সার্জিক্যাল মাস্ক পরিহিত অবস্থায়। ইনি-ই সিনিয়র রিপোর্টার মুজিবুল ইসলাম। দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস থেকে বাঁচার জন্য মুখে সার্জিক্যাল মাস্ক পরেছেন। দেখা গেল রিপোর্টার মুজিবুল ইসলামের পেছনে একটা টাওয়ারের ওপর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ঘন বেগুনী রঙের ধোঁয়া, ক্রমশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে! আরো দেখা গেল, তার থেকে খানিকটা দূরেই হাজার হাজার লোক গাড়ি, দোকানপাট ভাঙচুর করছে।

"ইভান," বলে চলল মুজিবুল ইসলাম, "আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমি যে টাওয়ারটির সামনে দাড়িয়ে আছি, সেই টাওয়ারের ওপর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। এখন থেকে প্রায় পনেরো মিনিট আগে এই টাওয়ারটির ওপরেই প্রচণ্ড শব্দে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে, আর তারপর থেকে অনবরত এই অসহনীয় দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস বের হয়েই চলেছে। অন্যান্য স্থানেও একই অবস্থা, প্রথমে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ আর তারপর গ্যাস নির্গমন। এবং তিনটি স্থানে একই সময়ে বিস্ফোরণ এটাই প্রমাণ করে যে এটা কোনো দুর্ঘটনা নয় বরং একটা পরিকল্পিত ঘটনা। আরও অবাক করার মত ব্যাপার হচ্ছে, এই বিস্ফোরণের পর থেকেই মানুষ যেন ক্ষোভে ফেটে পড়েছে, তাদের এই ক্ষোভ যে আসলে কার ওপর সেটা হয়ত তারা নিজেরাও জানে না। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এসে অপ্রকৃতিস্থের মত যানবাহন, দোকানপাটের ওপর ঝাপিয়ে পড়ছে!" মুজিবুল ইসলাম হয়ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। আচমকা একজন ভয়ঙ্কর দর্শণ লোক লাফিয়ে পড়লো ক্যামেরার সামনে! লোকটিকে দেখতে ভীতিকর লাগছে তার চোখ দুটোর জন্যে, কারণ তার চোখ বেগুনী রঙের! একটা চিৎকার করে সামনের দিকে থাবা মারলো লোকটি। কিছুক্ষণের জন্য পর্দায় অন্ধকার নেমে এলো। তারপর যখন পর্দায় আলো ফুটলো, তখন সেখানে দেখা গেল নিউজ রিডার মারজান ইভানকে।

"আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত," গলায় আন্তরিকতা ঢেলে দিয়ে বললেন তিনি, "দুর্ঘটনাবশত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় আমরা এ মুহূর্তে মুজিবুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। চলে যাচ্ছি পরবর্তী খবরে।"

পরবর্তী খবরে আর যাওয়া হল না, আবার অন্ধকার নেমে এল টিভির পর্দায়। কিছুক্ষণ অন্ধকার থাকার পর ঝিরঝির করতে শুরু করলে বাবা রিমোট চেপে টিভি বন্ধ করে দিলেন। তারপর একটা দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন।

"এসব হচ্ছেটা কী দেশে?" আবীরের পেছন থেকে বলে উঠলেন মা। টিভির খবর শুনে কখন যে মা আবীরের পেছনে এসে দাড়িয়েছেন তা আবীর খেয়ালই করে নি।
"কে জানে!" উদাস ভঙ্গীতে বললেন বাবা, "হয়ত কোন পলিটিক্যাল পার্টির কারসাজি, দেশে বিশৃঙ্খলা বাধানোর চেষ্টা।" তারপর বিরক্তির সাথে টিভির দিকে তাকিয়ে বললেন, "টিভিটার আবার কী হল?!"

টিভি বন্ধ, সুতরাং খবর দেখার বা শোনার কোন উপায় আপাতত নেই। অগত্যা সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল আবীর, তারপর নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বিছানার দিকে হাটা ধরলো সে। তার ঘুম পাচ্ছে।

বুউউমমমমমমমমম!!!!!!!!!!

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল! চমকে উঠলো আবীর। বিস্ফোরণ খুব কাছাকাছিই কোথাও হয়েছে। তা নাহলে এত বিকট শব্দ হত না। দিক পরিবর্তন করে ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালার কাছে গেল আবীর। বিস্ফোরণের শব্দটা দক্ষিণ দিক থেকেই এসেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই আবীরের দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল! সে দেখতে পেল, তাদের বাসা থেকে মাত্র ত্রিশ-পয়ত্রিশ গজ দূরের একটা টাওয়ারের ওপর থেকে গাঢ় বেগুনী রঙের গ্যাস দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে; ঠিক যেমনটা কিছুক্ষণ আগে টিভিতে দেখেছিল!

গ্যাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আবীরের নাকে এসে ঠেকলো একটা ঝাঁঝালো গন্ধ। কী বিচ্ছিরি গন্ধ! আবীরের মনে হচ্ছিলো সে বুঝি এক্ষুণি দম আটকে মারা যাবে। জানালার কাছ থেকে সরে এলো আবীর।

ওয়াক! ও-য়া-আ-আ-ক!!

পেট চেপে ধরে বিছানায় বসে পড়লো আবীর। তার বমি বমি লাগছে। বমি যেন গলা পর্যন্ত উঠে এসেও শেষ মেষ আর বের হলো না। বিছানা থেকে উঠে সে ছুটে গেল দরজার কাছে গেল সে। দরজা খুলে বাইরে বের হলো। দরজা খুলতেই সে দেখতে পেল রূপাকে, ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে রূপা। রূপাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থমকে দাড়ালো আবীর। রূপার হাতে একটা ধারালো ছুরি চকচক করছে! ফল কাটার ছুরি। সম্ভবত রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসেছে। আবীর অবাক হয়ে তার বোনের মুখের দিকে তাকালো, আর সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো। রূপার চোখ দু'টো বেগুনী রঙের!

“বাবাআআআ!! মাআআআআ!!!!!” আবীর চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল সিড়ির কাছে। বাবা-মাকে ডাকতে ডাকতে সিড়ি দিয়ে নামলো সে। দেখলো বাবা আর মা দু'জনই ড্রয়িং রূমে সোফার সামনে দাড়ানো।

“বাবা! মা! দ্যাখো রূপা আপুর কী যেন....” কথাটা শেষ করতে পারলো না আবীর। বাবার চোখে চোখ পড়তেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল তার। তারপর মায়ের দিকে তাকালো। রক্ত হিম হয়ে গেল আবীরের। বাবা মা দু'জনেরই চোখ বেগুনী রঙের! সিড়িতে পায়ের শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকালো সে। ধীর পায়ে সিড়ি ভেঙে নীচে নেমে আসছে রূপা, তার হাতে ধরালো ছুরি। তার বেগুনী চোখ দু'টো নিষ্প্রাণ, তাতে প্রাণের ছিটেফোটাও নেই!

ততক্ষণে বাবা আর মাও আবীরের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। আবীর বুঝতে পারলো না সে কী করবে। সে জায়গা থেকে নড়তেও পারছে না, তার পা দু'টোর ওজন যেন লক্ষ লক্ষ গুণ বেড়ে গেছে। অনেক কষ্টে আবীর খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করল। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল দরজাটা খোলা। আর এক মুহূর্তও দেরি করল না সে, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজা বরাবর ছুট লাগালো। দরজা দিয়ে বেরিয়ে কতক্ষণ দৌড়েছে সে জানে না, একসময় সে নিজেকে আবিষ্কার করলো তার বাসা থেকে বেশ অনেকটা দূরে একটা রাস্তার ওপর। রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাড়িয়ে আছে সে। অন্যান্য সময় এই রাস্তাটা খুব ব্যস্ত থাকে, সারাক্ষণ গাড়ি-ঘোড়া চলে এই রাস্তা দিয়ে। কিন্তু আজ রাস্তাটা একেবারেই ফাঁকা; রাস্তায় একটা সাইকেল পর্যন্ত নেই!

খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেয়ার জন্যে থামলো আবীর। তার বুক হাপরের মত ধড়ফড় করছে। কিন্তু বেশিক্ষণ দাড়াতে পারলো না সে ঐ জায়গায়। অল্প কিছু সময় বাদেই সে যা দেখলো তাতে তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। আশেপাশের বিল্ডিংগুলো থেকে শত শত মানুষ বেরিয়ে আসছে। সবাই একসঙ্গে! এবং সবার চোখ বেগুনী বর্ণ ধারণ করেছে! চোখের বেগুনী রঙের কারণেই সবাইকে ভয়ঙ্করদর্শন লাগছে।

আবীরের ওপর চোখ পড়তেই মানুষগুলো সবাই একসঙ্গে থমকে দাড়ালো। তারা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আবীরের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর সবাই একযোগে হাটা শুরু করল তার দিকে। আবীর বুঝলো, এখানে আর কিছুক্ষণ দাড়ালে তার জীবনের সমাপ্তি এখানেই লেখা হয়ে যাবে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দৌড়াতে শুরু করল সে।

অনেকটা পথ দৌড়ানোর পর আবার থমকে দাড়াতে হল। কারণ সে যেদিকে দৌড়াচ্ছিলো ঠিক সেদিক থেকে আরো একটা দল হেটে আসছে। প্রায় কয়েক হাজার লোকের একটা একটা দল! এখন আর পেছনে ফিরে যাওয়ারও উপায় নেই। কারণ ঐদিকে গেলে আবার আরেক দলের খপ্পরে পড়বে। বিপদের ওপর বিপদ!

“অ্যাই ছেলে! অ্যাই!!”
হঠাৎ একটা মেয়েকণ্ঠের ডাক শুনে চমকে উঠলো আবীর। এদিক-সেদিক তাকিয়ে সে মেয়েটাকে খুজতে লাগলো। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেল না।
“আরে এইদিকে দ্যাখো! তোমার ডানদিকে!”
ডানদিকে তাকালো আবীর। সে অবাক হয়ে দেখলো তার ডানপাশে একটা ডাস্টবিনের ভেতর থেকে মাথা বের করে রয়েছে একটা মেয়ে। মেয়েটির চোখ বেগুনী না, কথাবার্তাও স্বাভাবিক।
“ধরা পড়তে না চাইলে চলে এসো এখানে!”

তাড়া দিয়ে বললো মেয়েটা। একটু দ্বিধা হলেও আবীর দ্রুত ডাস্টবিনটার মধ্যে নেমে পড়লো। ডাস্টবিনের ভেতরে আবর্জনার বোটকা গন্ধ। কিন্তু এখন এসব নিয়ে ভাবার সময় না। এখন যে কাজটা সবচাইতে জরুরী তা হল নিজের জীবন বাঁচানো। অনেকক্ষণ ডাস্টবিনের ভেতরে মাথা নীচু করে বসে রইলো তারা দু'জন। এক পর্যায়ে ডাস্টবিনের ভেতর থেকে মাথা বের করে বাইরের অবস্থা দেখে নিলো মেয়েটা।

“ওরা চলে গেছে।” বলেই ডাস্টবিনের ভেতর থেকে বাইরে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিলো মেয়েটা। মেয়েটার দেখাদেখি আবীরও উঠে দাড়ালো। ডাস্টবিনের বাইরে বেরিয়ে এলো তারা দু'জনে। মেয়েটা আগে পিছে না তাকিয়ে কোন কথাবার্তা না বলে হনহন করে হাটা শুরু করে দিল। আবীরও দ্রুত পায়ে হাটতে শুরু করল মেয়েটির পাশে পাশে।

“আরে একটু আস্তে হাটো!” হাপাতে হাপাতে বলল আবীর, “ওদিকে যাচ্ছ কোথায়?”
“জানি না। তবে এই এলাকা নিরাপদ না।” আবীরের দিকে না তাকিয়েই বলল মেয়েটি। একটু থেমে তারপর আবার বলল, “একটা নিরাপদ জায়গা খুজতে হবে। যেখানে আশ্রয় নিয়ে কিছুক্ষণ অন্তত একটু শান্তিতে বেঁচে থাকা যাবে।”

শান্তি? মেয়েটা আশা করছে কীভাবে যে নিরাপদে থাকতে পারলেই সে শান্তিতে থাকতে পারবে? আবীর মনে মনে ভাবলো, সবার মত হয়ত এই মেয়েটির পরিবারেরও একই অবস্থা। তাই সে নিজে যতই নিরাপদে থাকুক না কেন, পরিবারের জন্য যে দুশ্চিন্তা তা থেকে তো আর মুক্ত থাকতে পারবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই মেয়েটি কীভাবে স্বাভাবিক আছে?! শুধু এই মেয়েটিই না, আবীর নিজেও একদম স্বাভাবিক আছে। কিন্তু কীভাবে?

"এসব হচ্ছেটা কী?!" বিড়বিড় করে বলতে লাগলো আবীর, "আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না! কী থেকে কীভাবে কী হয়ে গেল? সারাদেশেই কি একই অবস্থা?"
"আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না।" আবীরের দিকে না তাকিয়েই মেয়েটি উত্তর দিল, "আমি প্রথমে আমার বাড়ির লোকদের তাড়া খেয়ে বাসা থেকে পালিয়েছি, তারপর গিয়ে পড়লাম অন্তত কয়েক লাখ লোকের সামনে। তাদের তাড়া খেয়ে এসে লুকিয়েছিলাম ঐ ডাস্টবিনে।"

হাটতে হাটতে চারপাশে তাকাতে লাগলো আবীর। এত বছরের চেনা এই শহরটা আজ যেন হঠাৎ-ই অচেনা হয়ে উঠেছে। রাস্তায় কোন মানুষজন নেই; যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত দেখা যায় কেবল ভাঙা দোকানপাট আর যানবাহনের ভগ্নাবশেষ। রাস্তার বাঁ দিকে একটা লেক দেখা যাচ্ছে। লেকটা দেখে আবীর চিনতে পারল। এটা ধানমণ্ডি লেইক! জায়গাটার এ কি অবস্থা!!

"পাকিস্তান জিন্দাবাদ! পাকিস্তান জিন্দাবাদ!"

চমকে উঠলো আবীর। "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" বলে শ্লোগান দিচ্ছে কারা যেন! আবীর মেয়েটির দিকে তাকালো। মেয়েটি আবীরকে লুকিয়ে পড়তে ইশারা করে দ্রুত রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে থাকা একটা সিএনজির পেছনে লুকিয়ে পড়লো। আবীরও একই জায়গায় লুকালো। সিএনজির আড়াল থেকে ওরা দেখতে পেল, প্রায় বিশ-

পচিশজনের একটা দল রাস্তা ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে, তাদের মুখে “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” শ্লোগান। একধরনের ঘোর লাগা কণ্ঠে তারা শ্লোগান উচ্চারণ করছে। এ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল আবীর। এসব হচ্ছেটা কী এ দেশে??!!!

আবীর আর মেয়েটি যেই সিএনজির পেছনে লুকিয়ে ছিল সেটাকে পাশ কাটিয়ে “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” শ্লোগান উচ্চারণ করতে করতে চলে গেল দলটি। প্রথমে আবীর আর তারপরে মেয়েটি বেরিয়ে এল সিএনজির পেছন থেকে। আবীরের চোখে কৌতুহল, সে তার কণ্ঠেও সেই কৌতুহল ঢেলে দিল, “এরা কারা? আর ঐ শ্লোগান দিতে দিতে তারা যাচ্ছেই বা কোথায়?”

“কে জানে!” দায়সাড়া ভঙ্গিতে জবাব দিল মেয়েটি।
“এদেরকে ফলো করলে হয়ত কিছু জানা যেতে পারে।” মাথা চুলকাতে চুলকাতে কথাটা বলল আবীর।
মেয়েটি চোখ বড় বড় করে তাকালো আবীরের দিকে। আবীরও তাকালো মেয়েটির দিকে। সে ভেবেছিলো মেয়েটি বোধহয় রাজি হবে না। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে মেয়েটি বলল, “চলো।”

৭.

মতিঝিল শাপলা চত্বরে চারটা বাস পাশাপশি কাত করে রেখে একটা মঞ্চের মত বানানো হয়েছে। তার ওপরে দাড়িয়ে আছে দশজন লোক। আর মঞ্চটিকে ঘিরে আছে নারী-পুরুষ, ছেলেবুড়ো মিলিয়ে কম করে হলেও কয়েক লক্ষ মানুষ! চারদিক থেকে আরও হাজার হাজার লোক এসে যোগ দিচ্ছে তাদের সঙ্গে। যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যাচ্ছে ততদূর থেকে মানুষ কেবল আসছেই! মানুষগুলোর চেহারাই বলে দিচ্ছে তারা সবাই একধরনের ঘোরের মধ্যে আছে। যারা মঞ্চের ওপরে দাড়ানো তাদের চেহারাতেও ঘোরের স্পষ্ট ছাপ দেখা যাচ্ছে।

মঞ্চে দাড়ানো লোকগুলোর মধ্যে একজন গমগমে স্বরে কথা বলতে আরম্ভ করল, “আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে আমরা যে ভুল করেছিলাম, তা শুধরাবার সময় এসে গেছে। আমরা আমাদের সেই ভুল শুধরে নেব।”

মঞ্চটিকে ঘিরে থাকা লক্ষ লক্ষ লোক গুঞ্জন তুললো, “শুধরে নেব! শুধরে নেব!”
-“আমরা নিজেদের মুসলিম ভাইদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে অনেক বড় অন্যায় করেছিলাম।”
-“অন্যায় করেছিলাম! অন্যায় করেছিলাম!”
-“আমরা পাকিস্তানের সাথে বেঈমানী করেছিলাম।”
-“বেঈমানী করেছিলাম! বেঈমানী করেছিলাম!”
-“আজ আমরা সবাই তার প্রায়শ্চিত্ত করব ইনশাআল্লাহ!”
-“ইনশাআল্লাহ! ইনশাআল্লাহ!”
-“সবাই বল, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।”
-“পাকিস্তান জিন্দাবাদ! পাকিস্তান জিন্দাবাদ!”

বিস্ফারিত চোখে পুরো ঘটনাটা দেখছে আবীর আর তার সঙ্গের মেয়েটি। তাদের চোখের সামনে যা ঘটে যাচ্ছে, তা যেন তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না। মনে হচ্ছে যেন একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখছে তারা! মানুষগুলো "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" শ্লোগান দিয়েই যাচ্ছে।

লোকগুলোকে অনুসরণ করতে করতে প্রায় দেড় ঘণ্টা পায়ে হেটে এখানে এসে পৌছেছে তারা। এখন তারা লুকিয়ে আছে একটা আগুনে পোড়া বাসের পেছনে, সেখান থেকেই মাথা একটুখানি বাইরে বের করে তারা এই দৃশ্য দেখছে। দেড় ঘণ্টা হাটার পর স্বাভাবিকভাবেই তাদের ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা, কিন্তু চোখের সামনে যা দেখছে তাতে তাদের ক্লান্তি উবে গেছে!

আবীরের পিঠের ওপর একটা থাবা পড়তেই লাফিয়ে উঠলো আবীর। তাকে লাফিয়ে উঠতে দেখে মেয়েটিও তড়াক করে পেছনে ফিরল। দেখলো, তিনজন লোক পাশাপাশি দাড়িয়ে একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের সেই দৃষ্টিতে প্রাণের কোন ছিটেফোটাও নেই! আস্তে আস্তে তারা তাদের দু'হাত ওপরে তুলল, একই সঙ্গে। তারপর হাত দু'টি প্রসারিত করতে লাগলো আবীর আর মেয়েটির দিকে। তারা দু'জনই ভয়ে বরফের মত জমে গেছে!

"পালাও!!!"

চিৎকার করে মেয়েটির উদ্দেশ্যে বলল আবীর। তারপর নিজেই চোখ বুজে দৌড়াতে শুরু করল। দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময় যখন চোখ খুলল তখন দেখলো মেয়েটিও তার পাশে পাশে দৌড়াচ্ছে। মেয়েটির গায়ে জোর আছে, মনে মনে স্বীকার করল আবীর।

"ওরা কী পেছনে আসছে?" হাপাতে হাপাতে জিজ্ঞেস করল আবীর।

“পেছনে তাকিয়ে দেখার সময় নেই এখন।” মেয়েটি বলল, “যতদূর পারো দৌড়াতে থাকো!”

আবীর আর পারছে না। তাকিয়ে দেখলো মেয়েটিরও গতি কমে আসছে। খানিকটা পথ সামনেই রাস্তার পাশে একটা পার্ক দেখা যাচ্ছে। ওখানে ঢুকে পড়লে কেমন হয়? ওখানে গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

“চলো ঐ পার্কটাতে ঢুকে পড়ি, ওখানে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকা যাবে বলে মনে হচ্ছে।” আবীর ওদিকে দেখিয়ে বলল। মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটি। তারপর দিক পরিবর্তন করে পার্কে ঢুকে পড়লো দু’জনে।

পার্কের পরিবেশ খুবই সুনসান, নিরিবিলি। গাছপালা, ঝোপঝাড় সব অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে উঠেছে। এর ফলে এমন একটা অবস্থা হয়ে দাড়িয়েছে যে এখানে একটা আস্ত হাতি লুকিয়ে থাকলেও বাইরে থেকে চোখে পড়া মুশকিল! আজ থেকে বছর খানেক আগে পুলিশ এই জায়গাটাকে সীল করে দিয়েছিল। কারণ এখানে বেশ কয়েকবার একজন সাইকোপ্যাথ কিলারকে ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে। এই খবর ছড়িয়ে পর থেকেই কেউ আর এই পার্কের ধারে কাছেও আসতে সাহস পায় না। এখন অবশ্য ভয়ের কোন কারণ নেই। দেশের সব মানুষের যেই অবস্থা, সাইকোপ্যাথ কিলারেরও সেই একই অবস্থাই হওয়ার কথা।

একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে দু’জনেরই ঝিমুনি চলে এসেছিলো। হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেয়ে সোজা হয়ে বসলো আবীর। একবার ভাবলো শোনার ভুল কিনা। পাশে তাকিয়ে দেখলো মেয়েটিও সোজা হয়ে বসেছে। শব্দ সেও শুনেছে। তারমানে ভুল শোনে নি আবীর।

-“একটা শব্দ শুনতে পেলে?”

-“হুম। মনে হল কেউ যেন কথা বলছে।”

-“শব্দটা এখনো আসছে।”

-“হ্যা। কিন্তু কী বলছে তাই তো বুঝতে পারছি না!”

আবীর কান খাড়া করল। শুনতে পেলো কেউ মন্ত্র পড়ার মত করে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছে।

“জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর, জয় কপীশ তিহু লোক উজাগর......”

এবারে কিছুটা পরিষ্কার হল আবীরের কাছে। সে বলল, “মনে হচ্ছে যেন কেউ হনুমান চল্লিসা পড়ছে।”

“রামদূত অতুলিত বলধামা, অংজনিপূত্র পবনসূতনামা......”

মেয়েটিও কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। তারপর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, “আসলেই তো! কিন্তু এখানে হনুমান চল্লিসা কে পড়ছে?”

“কে জানে!” বলল আবীর। তারপর ডানহাতের তর্জনী তুলে একটা ঝোপের দিকে ইশারা করে বলল, “ঐ দ্যাখো। হনুমান চল্লিসা পড়ার শব্দ ঐ ঝোপের ওদিক থেকে আসছে।”

“মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী, কুমতি নিবার সুমতি কে সঙ্গী......”

আবীর উঠে দাড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও। তারপর তারা হাটা ধরল ঝোপটার দিকে। ঝোপের অপর পাশ থেকে একজন এখনো হনুমান চল্লিসা পড়েই যাচ্ছে।

“কংচন বরণ বিরাজ সুবেশা, কানন কুংডল কুংচিত কেশা......”

ঝোপের কাছাকাছি এসে দাড়ালো আবীর আর মেয়েটি। আবীরের ধারনাই ঠিক, হনুমান চল্লিসা পড়ার শব্দ এই ঝোপের আড়াল থেকেই আসছে। তারা দেখলো, ঝোপের আড়ালে কেউ একজন মাথা নীচু করে জবুথবু হয়ে বসে আছে। আবীররা যে তার পেছনে এসে দাড়িয়েছে তা সে খেয়ালই করে নি। সে বিড়বিড় করেই চলেছে।

“হাথবজ্র ঔ ধ্বজা বিরাজৈ, কাংথে মুংজ জনেবূ সাজৈ......”

“এই যে...” আস্তে করে ডাকলো আবীর। কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। সে বিড়বিড় করে হনুমান চল্লিসা আউড়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। আবীরের ডাকে কাজ না হওয়ায় এবারে মেয়েটি ধমকে উঠলো।
“অ্যাই! আমরা ডাকছি কানে যায় না?!”
এবারে কাজ হল। ঝোপের আড়ালে লুকানো ছেলেটি ভয়ে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো।
“নাআআআ...!!!” চিৎকার করতে লাগলো ছেলেটি, “আমাকে মে-মেরো না! আমাকে... আ-আমাকে...”
“চোপ!” আরও জোরে ধমকে উঠলো মেয়েটি, “একদম চোপ!”

ছেলেটি চিৎকার থামালো, কিন্তু মেয়েটির ধমকের কারণে নয়। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, হাপাচ্ছে সে। পকেট হাতড়ে একটা ইনহেলার বের করে মুখের ভেতরে দু'বার স্প্রে করল ছেলেটি।

মেয়েটি এবার শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কে তুমি? আর এখানে কী করছ?”
ছেলেটি একবার মেয়েটির দিকে আর একবার আবীরের দিকে তাকালো। মনে হচ্ছে সে কিছু বুঝতে পারছে না। প্রথমেই ধমক খেয়ে ভড়কে গেছে বেচারা। মেয়েটি আরো নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, “নাম কী তোমার?”
“দী-দীপ।” ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল ছেলেটি।

নামের প্রসঙ্গে আবীরের মনে পড়ল, এতক্ষণ ধরে যে মেয়েটি তার সঙ্গে আছে তার নামটাই এখনো পর্যন্ত জানা হয় নি। মেয়েটিও তার নাম একবারও জানতে চায় নি। আজ সারাদিনে তারা একের পর এক যেসব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে, তারপর আর তাদের কারো মাথায়ই কারো নাম পরিচয় জিজ্ঞেস করার চিন্তা কাজ করে নি। আবীর ভাবলো মেয়েটিকে তার নাম জিজ্ঞেস করবে কিনা। অবশ্য তার আর প্রয়োজন হল না, দীপ নামের ছেলেটিই জিজ্ঞেস করল।

“তো-তোমরা কারা?”
“আমি আবীর।” নিজের নাম বলল আবীর।
“আমি জোনাকি।” বলল মেয়েটি।

জোনাকি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু আবীর ঠোটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে ইশারা করায় থেমে গেল সে। একটা গুঞ্জনের শব্দ ভেসে আসছে রাস্তার ওদিক থেকে, মনে হচ্ছে যেন অনেকগুলো লোক শ্লোগান দিচ্ছে একসাথে। শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আছে। তারমানে লোকগুলো শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। আবীর ইশারা করতেই জোনাকি আর দীপ ঝোপটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, তাদের পাশ ঘেষে আবীরও লুকিয়ে পড়ল। তারপর রাস্তার দিকে চোখ রেখে ঘাপটি মেরে বসে রইলো তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দেখতে পেল লোকগুলোকে। প্রায় বিশ পচিশজন লোক রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে মুখে “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” উচ্চারণ করতে করতে।
“দ্যাখো! সেই লোকগুলোই!” উত্তেজিত কণ্ঠে বলল জোনাকি।
“হুমম।” গম্ভীর মুখে আবীর জবাব দিল।

লোকগুলোকে চিনতে পারল আবীর। এই লোকগুলোর পিছু নিয়েই সে আর জোনাকি মতিঝিল শাপলা চত্বরে গিয়েছিলো। লোকগুলো যে পথে মতিঝিল গিয়েছিলো, এখন সে পথেই ফিরে যাচ্ছে। তারা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত আবীর চুপচাপ তাকিয়ে রইলো তাদের যাত্রাপথের দিকে।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর আবীর বলল, “মনে হচ্ছে যেন এদেরকে কোন জায়গা থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠানো হয়েছিলো, মতিঝিলে এসে সেই শেখানো বুলি আউড়ে তারপর আবার সেই জায়গাতেই ফিরে যাচ্ছে।
“তাই তো মনে হচ্ছে।” আবীরের কথায় সায় জানিয়ে জোনাকি বলল, “কিন্তু এরা যাচ্ছে কোথায়? আর এদের চালাচ্ছেই বা কে?”

“আমি তো এখনো এটাই বুঝতে পারছি না যে এসব আসলে কী হচ্ছে!” অস্থির ভঙ্গিতে বলল দীপ। এখন আর তোতলাচ্ছে না সে। অনেকটাই সহজ হয়ে এসছে। পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো আবীর আর জোনাকি। দীপের কথার কী জবাব দেবে তারা? তারা নিজেরাই তো জানে না যে এসব কী হচ্ছে!
“কারা তোমরা?”

হঠাৎ বলে উঠলো একটি কণ্ঠ। প্রচণ্ড আতঙ্কে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো তিনজনে একসঙ্গে। তার আগেই কণ্ঠটি ধমকে উঠলো, “খবরদার! কোন শব্দ করবে না!”

ধমকের চোটে চিৎকার করতে ভুলে গেল তারা। আস্তে আস্তে পেছন ফিরল। দেখলো বেশ লম্বা এবং রোগা একজন লোক দাড়িয়ে আছেন। লোকটির মাথায় বড় বড় চুল পাখির বাসার মত উশকো খুশকো হয়ে আছে, মুখভর্তি দাড়ি-গোফের জঙ্গল, চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করছে। পরনে একটা শতচ্ছিন্ন ময়লা শার্ট, আর তার নিচে একটা ময়লা প্যান্ট। তার মুখ দাড়ি গোফের জঙ্গলে ঢাকা থাকায় চেহারা দেখে বয়স বোঝা যাচ্ছে না। লোকটির হাতে একছড়া সাগর কলা আর পাউরুটির প্যাকেট।
“তোমরা কারা? এখানে কী করছ?” লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলেন।
“ঐ লোকগুলোর তা-তাড়া খেয়ে এ-এখানে এসে পড়েছি।” তোতলাতে তোতলাতে বলল দীপ। একটা ঢোক গিলে সে আবারও বলল, “আ-আপনার সমস্যা হলে আমরা চ-চলে পারি।”

লোকটি কোন কথা বললেন না। কলা আর পাউরুটির প্যাকেট পাশে রেখে একটা গাছের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়লেন তিনি। আবীর আর জোনাকি তাকিয়ে আছে খাবারগুলোর দিকে। খাবারগুলো দেখার পর থেকেই তাদের পেটে খিদে মোচড় দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। সেই কখন থেকে তারা না খেয়ে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে! লোকটি বোধহয় বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, “তোমাদের বোধহয় খাওয়া দাওয়া কিছু হয় নি। এখানে যা আছে খেতে পারো।”

আর দাড়ালো না আবীর আর জোনাকি, আগে পিছে কিছু না ভেবেই ঝাপিয়ে পড়ল খাবারগুলোর ওপর। তাদের দেখাদেখি দীপও। আবীর সাধারণত অপরিচিত কারোর দেয়া কিছু নেয় না, খাওয়া তো দূরে থাক! এই ট্রেনিং তার ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু আজ সেসব নিয়ে ভাববার সময় নেই। তিনজনেই গোগ্রাসে গিলছে।

খেতে খেতে একসময় লোকটির দিকে তাকালো আবীর। আবীরের কেন যেন মনে হল লোকটিকে সে আগে কোথাও দেখেছে। মুখে ময়লা আর দাড়িগোফের জঙ্গলের কারণে তার চেহারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, তবুও চেহারাটা বেশ পরিচিত ঠেকছে। কোথায় দেখেছে আবীর লোকটাকে? লোকটার আপাদমস্তক ভাল করে একবার দেখে নিলো আবীর। বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছে ভিখারী। খাবারগুলো বোধহয় সুযোগ বুঝে কোন দোকান থেকে চুরি করে এনেছেন।
"আপনি খাবেন না?" আবীর জিজ্ঞেস করল লোকটিকে।
লোকটি মুচকি হেসে বললেন, "তোমরা খাও। আমি পরে আবার ব্যবস্থা করে নেব।"
লোকটির কথা শুনে খানিকটা অবাক হল আবীর। লোকটির কথাবার্তা শুনে কোন ভিখারীর কথা বলে মনে হচ্ছে না। আবীর লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার পরিচয়টা জানা হয় নি।"
"ওহ হ্যা!" লোকটি বললেন, "আমি সাইফ রাজু। ডক্টর সাইফ রাজু।"

আতঙ্কে রক্ত হিম হয়ে এলো আবীরের। খুব সাবধানে অন্য দু'জনের দিকে তাকালো সে। খাওয়া থামিয়ে দিয়েছে তারা, তাদের মুখেও ভয়ে ছাপ ফুটে উঠেছে। উঠে দাড়িয়ে দৌড় দেবে কিনা ভাবছে তারা। কিন্তু তিনজনের একজনও এক চুল পরিমাণ নড়তে পারছে না, আতঙ্কে জমে গেছে তাদের সারা শরীর। তারা একজন সাইকোপ্যাথ কিলারের সামনে বসে আছে!

ড. সাইফ রাজু, বাংলাদেশের সবচাইতে বড় বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন। লোকে বলাবলি করত তার নাকি মানসিক সমস্যা আছে, তা নাহলে কি কেউ হার্ভার্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ ছেড়ে বাংলাদেশে পড়ে থাকে?! লোকজন জেনে বলত নাকি না জেনে তা ঠিক জানা নেই, কিন্তু ড. সাইফ রাজু যে আসলেই মানসিকভাবে সুস্থ নন তা জানা গেল যখন তিনি তার স্ত্রী আর কন্যাকে খুন করে লাপাত্তা হয়ে গেলেন।

সাইফ রাজু পালাক্রমে তাকালেন আবীর, জোনাকি এবং দীপের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "তোমরা যা ভাবছো আমি তা নই। আমি খুনী নই।"

আবীর এখনো নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রয়েছে লোকটির দিকে। তার অপরাধ প্রমাণিত, যে ছুরি দিয়ে তিনি তার স্ত্রী আর কন্যার গলা কেটেছিলেন সেই ছুরিতে তার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। মৃতদেহের গায়ে তার চুল পাওয়া গেছে। তারপরেও তিনি বলছেন যে তিনি খুনী নন!

"বুঝেছি।" সাইফ রাজু আবারও বললেন, "আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তো? কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি খুন করি নি।"

"ক্ক-কীভাবে বিশ্বাস করব? কী প্রমাণ আ-আছে যে আ-আপনি নি-নির্দোষ?" ভয়ে তোতলামী এসে গেছে জোনাকির। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত এই মেয়েটির মধ্যে ভয়ের কোন ছিটেফোটাও ছিলো না! আবীর খানিকটা অবাক-ই হল।

"যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো," ড. সাইফ বোঝানোর চেষ্টা করলেন, "আমি যদি খুনী হতাম, তাহলে কী মার্ডার ওয়েপন এমন জায়গায় রেখে দিতাম যেখান থেকে সহজেই খুজে পাওয়া যায়? আর তাতে কী নিজের হাতের ছাপ রেখে দিতাম ধরা পড়ে যাওয়ার জন্য? আর সবচাইতে বড় কথা, খুন করে লাশ আমি নিজের বাড়ির বাগানেই কেন মাটিচাপা দিয়ে রাখতে যাব? আমি কী এতই বোকা?" বলে কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন তিনি, তারপর কারো কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে তিনি বললেন, "সাইফ রাজু থেকে ড. সাইফ রাজু আমি এমনি এমনি হই নি। বুঝলে?"

তিনজনই মাথা নাড়ল। একদম অকাট্য যুক্তি! কিন্তু তবুও তাদের মন থেকে ভয়টা যেন কিছুতেই দূর হচ্ছে না। দীপ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে খু-খুনগুলো কে করল? আর আ-আপনাকেই বা কেন ফা-ফাঁসানো হল?"

"এখানে বসে বলা সম্ভব না।" উঠে দাড়াতে দাড়াতে বললেন প্রফেসর, "এই জায়গাটা নিরাপদ নয়। তোমরা চাইলে আমার সাথে আসতে পারো।" বলেই হাটা ধরলেন তিনি।

জোনাকি আর দীপ বুঝতে পারল না যে তারা কী করবে। তারা এখনো দ্বিধায় ভুগছে। শুধু আবীর আস্তে আস্তে উঠে দাড়ালো।

"আমার মনে হয় আমরা ওনাকে বিশ্বাস করতে পারি ।"

****

ঢাকা শহরের এই এলাকাটা একেবারেই সুনসান, নিরিবিলি। এখানে দিনের বেলায়ও সূর্যের আলো আসে না, তার কারণ স্পষ্ট হয় ওপরের দিকে তাকালেই। ওপরে মাকড়ের জালের মত বৈদ্যুতিক তার ছড়িয়ে আছে, কত বছর ধরে যে এই তারগুলোর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে না কে জানে! আধুনিকতার কোন ছোঁয়া লাগে নি এখানে। সমাজবিরোধী কার্যকলাপের জন্য এই এলাকা কুখ্যাত। সরু রাস্তার দু'ধারে পর পর অনেকগুলো ঝুপড়ির মত ঘর, ঘরগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাঁজার গন্ধ এসে নাকে লাগে। জনশ্রুতি আছে, এই এলাকায় কেউ ঢুকলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার বাড়িতে মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে। মুক্তিপণের টাকা সময়মত দিতে না পারলে অপহৃত ব্যক্তির লাশ পাওয়া যায় কোন এক গলির মুখে। হেরোইন কারবারি থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় অপরাধ এখানে হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আজ অবধি কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে কেউ শোনে নি। অনেক বড় মাপের রাঘব বোয়ালরা জড়িত আছে এর সঙ্গে।

রাস্তার দু'পাশের ঝুপড়িগুলো ছাড়াও বেশ কয়েকটা বিল্ডিং-ও চোখে পড়ে এখানে। বিল্ডিংগুলো দীর্ঘদিনের অযত্নে ভগ্নপ্রায়; জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরে গেছে, ফাটলের মধ্য দিয়ে গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন গাছের ডালপালা, লতাপাতা। দেয়ালে শ্যাওলা জমে দেয়ালের আসল রং ঢেকে গেছে। বিল্ডিংগুলো কম করে হলেও দশ-বারো বছর ধরে পরিত্যক্ত। এখন এগুলো চোর ডাকাতদের আস্তানা।

এরকম একটা জায়গায় একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে একজন বিজ্ঞানী থাকতে পারেন, তা কল্পনাও করা যায় না! সাইফ রাজু যে বাড়িটায় থাকেন সেটা দোতলা। বাইরে থেকে দেখে বোঝা না গেলেও ভেতরে ঢুকলে বোঝা যায় যে বাড়িটা আসলে বিশাল বড়। নীচ তলার ঘরটা, সম্ভবত আগে বসার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হত, এই ঘরের মেঝেতে গাদাগাদি করে বসলে কমপক্ষে ৫০-৬০ জনের জায়গা হবে। এই বাড়ির মালিক হয়ত অনেক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। এমন একটা বাড়ি ছেড়ে তারা কোথায় গেলেন, কেন গেলেন সেটাই প্রশ্ন।

আবীর, জোনাকি, দীপ এবং প্রফেসর সাইফ রাজু দোতলার একটা ঘরে একটা টেবিলকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে। জোনাকি আর দীপ খুটিয়ে খুটিয়ে ঘরের চারপাশটা দেখছে। ঘরের এক কোণে কাঠের তৈরি বেশ বড় একটা টেবিল। অনেক পুরনো টেবিল, জায়গায় জায়গায় ঘুণে খাওয়া; সম্ভবত এই বাড়িতেই ছিল টেবিলটা, বাড়ির মালিক রেখে গেছে। টেবিলের ওপর অনেকগুলো বীকার, টেস্টটউব, ফ্লাস্ক, গ্যাসজার সহ আরও অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছে। বিধ্বস্ত দেখতে একটা ল্যাপটপও দেখা যাচ্ছে টেবিলটার ওপর, ল্যাপটপটা ঠিক আছে নাকি নষ্ট তা বোঝা যাচ্ছে না। অনেক যন্ত্রপাতি আর লোহা লক্কড়ের টেবিলে জায়গা না হওয়ায় সেগুলো টেবিলের নিচে রাখা হয়েছে। এই যন্ত্রপাতিগুলো অবশ্যই বাড়ির মালিকের না, প্রফেসর সাইফ এগুলো আনিয়ে নিয়েছেন তার কাজের জন্য। একপাশে বেশ কিছু গাড়ির ব্যাটারিও দেখা যাচ্ছে। ঘরের আরেক কোণে দেখা যাচ্ছে একটা আলমারি। সেই আলমারিতে কী আছে কে জানে!

“এখানে থাকত তিনজন ছিঁচকে চোর।” বলতে শুরু করলেন সাইফ রাজু, “আমি যখন পুলিশের তাড়া খেয়ে এখানে চলে এলাম, তখন সেই চোরেরা আমাকে তাদের চাইতেও বড় ক্রিমিনাল ভেবে এখানে আশ্রয় দেয়।”

“কিন্তু এসব হল কীভাবে?” আবীর জিজ্ঞেস করল কৌতুহলী কণ্ঠে।

“সে অনেক লম্বা কাহিনী।” সাইফ রাজু একটা দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে বললেন।

“তবু আমরা শুনতে চাই স্যার।” বলল জোনাকি, মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো আবীর এবং দীপ।

“শোনো তাহলে।” বলে একটু থামলেন সাইফ স্যার, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “তার আগে বলো তো, তোমরা ড. নীলকণ্ঠ দেবনাথের নাম শুনেছ?”

“হ্যা,” বাকি দু’জন বলার আগেই আবীর বলে উঠলো, “বিখ্যাত বিজ্ঞানী নীলকণ্ঠ দেবনাথ, দু’বছর আগে নিউ ইয়র্কে একটা রোড এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন উনি।”

“ভুল।” গম্ভীর মুখে বললেন সাইফ স্যার, “ড. নীলকণ্ঠ কোন রোড এ্যাকসিডেন্টে মারা যান নি, তাকে খুন করা হয়েছিলো।”

বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল তিনজনেরই। তারা এতদিন ধরে জেনে এসছে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. নীলকণ্ঠ দেবনাথ রোড এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন, আর আজ প্রফেসর সাইফ রাজু বলছেন তাকে নাকি খুন করা হয়েছে?!

কেশে গলা পরিষ্কার করে বলতে শুরু করলেন সাইফ স্যার, “আজ থেকে দু’বছর আগের একটা দিন, সেদিন আমি সবে মাত্র বাসা থেকে বের হওয়ার হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি, ওমনি একটা অচেনা নাম্বার থেকে কল এলো। বিদেশী নাম্বার। রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে ভেসে এলো ড. নীলকণ্ঠ দেবনাথের ভয়ার্ত কণ্ঠ! তিনি হাপাতে হাপাতে যে অসংলগ্ন কথাগুলো বললেন সেগুলো ছিলো অনেকটা এরকম- ‘ওরা আমাকে ব্যবহার করেছে! আমার ট্যালেন্টের মিসইউজ করেছে ওরা! আমি না বুঝে আমার দেশের সাথে বেঈমানী করেছি! অনেক বড় অপরাধ করে ফেলেছি আমি!’ আমি তখন তাকে বললাম মাথা ঠাণ্ডা করে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে। তিনি

আবারও বলতে লাগলেন- 'ভয়ানক ষড়যন্ত্র! চৌদ্দটা দেশ টারগেট, তার মধ্যে আমাদের দেশও আছে!' আমি জানতে চাইলাম তিনি কোন ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন? তখন তিনি শুধু একটা কথা উচ্চারণ করলেন, আর সাথে সাথেই লাইন কেটে গেল। এরপর আমি বেশ কয়েকবার কল ব্যাক করলাম, দেখি ফোন বন্ধ। ভাবলাম তিনি হয়ত পরে আবার কল করবেন। কিন্তু তিনি আর কল করলেন না। তিন দিন পর কফিনে করে তার লাশ এলো বাংলাদেশে।" এ পর্যন্ত বলে একটু থামলেন ড. সাইফ।

"ড. নীলকণ্ঠ দেবনাথের বলা সেই শেষ কথাটা কী ছিল?" জিজ্ঞেস করল জোনাকি। বাকি দু'জনও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

"প্রজেক্ট পাই।" জবাবে বললেন সাইফ রাজু।

আবীরের মনে হল "প্রজেক্ট পাই" কথাটা সে আগেও কোথাও শুনেছে। কিন্তু কোথায় শুনেছে তা মনে করতে পারল না।

"প্রজেক্ট পাই?" খানিকটা অবাক হয়েই বলল জোনাকি।

"ঐযে থ্রী পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স- সেই পাই?" জিজ্ঞেস করল দীপ।

"হ্যা," বললেন সাইফ স্যার, "কিন্তু এক্ষেত্রে পাইয়ের মান দশমিকের পর নয় ঘর পর্যন্ত লাগবে।"

"তারপরে কী হল?" জোনাকি জানতে চাইলো।

একটু নড়ে বসলেন সাইফ স্যার, তার দেখাদেখি বাকিরাও নড়েচড়ে বসলো। তারপর তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "নীলকণ্ঠ দেবনাথের মৃতদেহ যখন দেশে নিয়ে আসা হল, তখন আমার একটু খটকা লাগছিলো। প্রথমে তার অসংলগ্ন কথাবার্তা, এরপরে হঠাৎ করে ফোনের লাইন কেটে যাওয়া, আর তার তিনদিন পর তার লাশ দেশে নিয়ে আসা- সব মিলিয়ে আমার যেটা মনে হল, তার মৃত্যু কোন এ্যাকসিডেন্ট থেকে হয় নি। আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে নীলকণ্ঠ এমন কোন বিষয়ে কিছু জেনে ফেলেছিলেন যা আমাদের দেশের জন্য তো বটেই গোটা মানবজাতির জন্য

বিরাট হুমকি। আর তিনি যাতে এ ব্যাপারে কোন তথ্য বাইরে পাচার করতে না পারেন, সেজন্যেই তাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই না, তিনি বলেছিলেন যে তিনি নাকি অনেক বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছেন না বুঝে। তারমানে তিনি যেই ষড়যন্ত্রের কথা বলছিলেন, তার সাথে তিনিও জড়িত ছিলেন।"

কথা থামিয়ে এক এক করে তিনজনের মুখের দিকে তাকালেন সাইফ রাজু, যেন তিনি তাদের মুখ থেকে কিছু শুনতে চান। কেউ কিছুই বলল না, বরং সবাই প্রচণ্ড কৌতুহল নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে "এর পরে কী হল" তা শোনার জন্য। তিনি বলতে শুরু করলেন, "আমি এ ব্যাপারে অনেক জায়গায় যোগাযোগ করলাম, বেশ কয়েকটা পত্রিকায় এ বিষয়ে লিখেও পাঠালাম। কোন পত্রিকায়ই আমার লেখা ছাপা হল না। কয়েকদিনের মাথায় একটা অজানা নাম্বার থেকে ফোনকল এলো, নাম্বারটা বাংলাদেশী। আমাকে বলা হল যে ড. নীলকণ্ঠ দেবনাথের ব্যাপার নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটির ফল ভালো হবে না। বুঝতে পারলাম, আমি যে জায়গাগুলোতে যোগাযোগ করেছি সেখান থেকেই খবর চলে গেছে। তারমানে এই পুরো ব্যাপারটার পেছনে যারা আছে তাদের দালালরা সব জায়গায় ওৎ পেতে আছে! আমি এই উড়ো কল আর ব্ল্যাকমেইলের ব্যাপারে প্রশাসনের সহায়তা চাইলাম। তারা আমাকে পূর্ণ আশ্বাস দিল যে আমার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি রাখা হবে না, আর ব্ল্যাকমেইলারকেও অতি দ্রুত পাকড়াও করা হবে। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে দেখি আমার স্ত্রী আর মেয়ে বাসায় নেই।"

গলা খানিকটা ধরে এলো সাইফ রাজুর। স্বাভাবিক হওয়ার জন্য একটু সময় নিলেন তিনি। প্রায় পনেরো কিংবা বিশ সেকেন্ড নীরবে কাটলো, কারো মুখে কোন কথা নেই। তারপর নীরবতা ভেঙে আবার বলতে শুরু করলেন তিনি, "আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ওরা হয়ত বাইরে কোথাও গেছে। কিন্তু আসল ঘটনা বুঝতে পারলাম কিছুক্ষণ পরে, যখন বাসায় পুলিশ এলো। আমার মাথায় রীতিমত আকাশ ভেঙে পড়ল, যখন শুনলাম পুলিশ আমাকে এ্যারেস্ট করতে এসেছে আমারই স্ত্রী-কন্যাকে

খুনের অপরাধে! পুলিশ বাগানে মাটি খুড়ে মা-মেয়ের লাশ পেল; গলা কেটে খুন করা হয়েছে তাদের। বাড়ি তল্লাশি করে স্টোর রূমে পাওয়া গেল খুনের অস্ত্র। ফল কাটার ছুরি, তাতে কালচে রক্তের দাগ! আমাকে হাতে হাতকড়া পড়িয়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হল। কিন্তু পুলিশ ভ্যানে উঠে দেখি সেখানে চলছে আরেক ষড়যন্ত্র। আমাকে ফল্স এনকাউন্টারে মারার পরিকল্পনা ছিল তাদের। আমি যে কীভাবে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলাম তা আমি নিজেই জানি না। আমার যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমি এখানে, আমার কাঁধে একটা ব্যান্ডেজ। ওখানে নাকি গুলি লেগেছিলো।"

কথা শেষ করে একটা দীর্ঘঃশ্বাস ফেললেন ড. সাইফ রাজু। তারপর তিনজনকে পালাক্রমে দেখে নিয়ে বললেন, "তখন আমি বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম, এই প্রজেক্ট পাই কোন যেন তেন ষড়যন্ত্র না। এটা কোন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র, যার পূর্বাভাস এতগুলো মৃত্যু!"

"আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে," আবীর বলল, "এই 'প্রজেক্ট পাই' শব্দটা আমি আগেও কোথাও শুনেছি।"

একসাথে সবকটা চোখ ঘুরে গেল আবীরের দিকে। সাইফ স্যার ভ্রু কুচকে বললেন, "কোথায় শুনে থাকবে?"

মাথা চুলকাতে চুলকাতে আবীর বলল, "সেটাই তো মনে করতে পারছি না।"

"কিন্তু স্যার, এর অর্থ কী?" প্রশ্ন করল দীপ।

"আমি এতদিন ধরে এটা নিয়েই গবেষণা করেছি, এটার মর্মোদ্ধার করার জন্যে।" হতাশ ভঙ্গিতে বললেন সাইফ স্যার, "মর্মোদ্ধার তো করে ফেলেছি, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে! যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন আর কিছু করার আছে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।"

"তারমানে," জোনাকি চোখ কপালে তুলে বলল, "এখন দেশে যা কিছুই হচ্ছে, তার মূলে এই প্রজেক্ট পাই?"

“হ্যা।” বলে উঠে দাড়ালেন সাইফ স্যার, তারপর হাটা ধরলেন যে টেবিলের ওপর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রাখা আছে তার দিকে। টেবিলের ওপর থেকে একটা প্যাড এবং একটা কলম নিয়ে ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন তিনি। প্যাডের ওপর কলম দিয়ে খস খস করে লিখলেন “৩.১৪১৫৯২৬৫৪”; পাইয়ের দশমিকের পর নয় ঘর পর্যন্ত মান। তারপর বললেন, “এখানে পাইয়ের এই মানের মধ্যেই পুরো ষড়যন্ত্রের নীল নকশা সংক্ষেপে লুকানো আছে। প্রথমত, ‘তিন’ দিয়ে বোঝানো হয়েছে তিনটি দেশের ষড়যন্ত্র। অর্থাৎ এই ষড়যন্ত্রের পেছনে রয়েছে তিনটি দেশ।”

“তার মধ্যে একটা দেশ অবশ্যই পাকিস্তান?” জিজ্ঞেস করল জোনাকি।

“না।” মাথা নেড়ে বললেন সাইফ স্যার, “পাকিস্তান এদের হয়ে কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু পাকিস্তানের শক্তি এদের ধারে কাছেও না। বরং পাকিস্তান এদের হাতে জিম্মি, বলতে গেলে এদের দালাল।”

“তারপর দশমিকের পরের অংশগুলোর মানে কী?” বলল আবীর। প্রসঙ্গ থেকে সরতে চাচ্ছে না সে।

“দশমিকের পর প্রথম দু’টো ডিজিট নিয়ে হয় চৌদ্দ,” বলতে লাগলেন সাইফ স্যার, “এই চৌদ্দ হচ্ছে ভিক্টিম দেশগুলোর সংখ্যা। অর্থাৎ চৌদ্দটি দেশ এই ষড়যন্ত্রের ভিক্টিম।”

চোখ কপালে তুলে দীপ বলল, “হায় ভগবান! তারমানে কেবল আমাদের দেশেই না, আরও চৌদ্দটা দেশে বর্তমানে একই অবস্থা?!”

“হ্যা।” দীপের প্রশ্নের জবাবে বললেন সাইফ স্যার। তারপর প্যাডে যেই জায়গাটায় পাইয়ের মান লিখেছেন তার নিচ দিয়ে লিখলেন “১৫-৯-২৬”, অর্থাৎ আজকের তারিখ। তারিখটা দেখিয়ে তিনি বললেন, “চৌদ্দ-এর পর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স-কে যদি এভাবে লেখা হয়, তাহলে সেটা হবে আজকের তারিখ। অর্থাৎ আজকের তারিখে পরিকল্পনা মোতাবেক চৌদ্দটা দেশে একযোগে বিস্ফোরণ হওয়ার কথা ছিল, এবং তাই হয়েছে।”

“আর তারপরের দু’টো ডিজিট?” জোনাকি জিজ্ঞেস করল।

“এটা নিয়ে এখনো দ্বিধায় ভুগছি।” দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন সাইফ স্যার, “তবে আমার মনে হচ্ছে, এই ফাইভ আর ফোর কোন শব্দকে নির্দেশ করছে।”
“কিংবা কোন শব্দের অদ্যাক্ষর।” যোগ করল জোনাকি, “ইংরেজী বর্ণমালার পঞ্চম বর্ণ ‘ই’, আর চতুর্থ বর্ণ ‘ডি’। হয়ত এই ফাইভ আর ফোর এমন দু’টো শব্দকে নির্দেশ করছে যাদের অদ্যাক্ষর ‘ই’ এবং ‘ডি’।”
“মনে পড়েছে!”

আবীরের উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো সবাই। তার চোখ দু’টো চকচক করছে। উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলল, “এতক্ষণে মনে পড়েছে, ‘প্রজেক্ট পাই’ কথাটা আমি কোথায় শুনেছি! আর সেই সাথে এটাও মনে পড়েছে যে ‘ই’ দিয়ে কী হতে পারে। যদিও সে ব্যাপারে শিওর না।”
সাইফ স্যার আবীরের কথা শুনে একটু নড়ে চড়ে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায় শুনেছ?”
“আমাদের কলেজের বাংলা ডিপার্টমেন্টের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় শুনেছিলাম।” আবীর বলল, “ভেতরে কেউ ফিসফিস করে ফোনে কথা বলছিলেন, সম্ভবত রায়হান স্যার। তিনি বলছিলেন, ‘প্রজেক্ট পাইয়ের জন্য সবই রেডী, এখন শুধু এফিব্যানের আসার অপেক্ষা।’ মনে হচ্ছিলো যেন এফিব্যান নামক কারোর বা কিছুর জন্য তাদের কাজ আটকে আছে।”
“তুমি ঠিক শুনেছিলে?” সবিস্ময়ে বললেন সাইফ স্যার।
“হ্যা।” আবীর বলল, “আরও একটা ব্যাপার, এফিব্যান শব্দের অদ্যাক্ষর তো ‘ই’! এখন এই ই দিয়ে যদি এফিব্যান হয়, তারমানে এফিব্যান এই ষড়যন্ত্রের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোন উপাদান, যাকে ছাড়া প্রজেক্ট পাই সফল করা যাবে না।”
“কিন্তু মানে কী এই এফিব্যানের?” জোনাকি প্রশ্ন করল।

প্রফেসর সাইফ রাজু কলম দিয়ে খস খস করে একবার লিখলেন “EFIBAN”, তারপর নিচে আবার লিখলেন “EFOEBAN”। কিছুক্ষণ লেখা দু’টোর দিকে তাকিয়ে

থেকে কিছু একটা ভাবলেন, তারপর আবার লিখলেন “E.F.O.E.B.A.N.”। মনে হচ্ছে যেন তিনি কিছু একটা মেলাবার চেষ্টা করছেন।

“দ্বিতীয়টা যদি হয়,” কলমের পেছনের অংশ দিয়ে কপাল চুলকাতে চুলকাতে বললেন প্রফেসর সাইফ, “তাহলে এটাই প্রজেক্ট পাইয়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ এটা ড. নীলকণ্ঠ দেবনাথের তৈরি সেই ভাইরাস, যার দ্বারা আক্রান্ত এখন আমাদের দেশসহ আরও চৌদ্দটি দেশের মানুষ।”

৮.

-অভিনন্দন ফাইজান খান। তোমাদের মিশন সফল।

-ধন্যবাদ মাস্টার ক্রুগো। সবই আপনার কৃপা।

-কিন্তু তোমাদের যে একটা ভুল হয়ে গেল ফাইজান।

-কী ভুল মাস্টার ক্রুগো? আমরা তো পরিকল্পনা অনুসারে একদম নির্ভুলভাবেই সবকিছু করেছি!

-আসলেই কি তাই? তাহলে তিন জায়গায় একসাথে বিস্ফোরণ হওয়ার বিশ মিনিট পর চতুর্থ বিস্ফোরণটা হল কেন?

-দুঃখিত মাস্টার ক্রুগো। চারটা বিস্ফোরণ একই সঙ্গে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ছোট্ট একটা ভুলের কারণে....

-আমাদের কাজে ছোট থেকে ছোট ভুলও মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াতে পারে ফাইজান! যেই বিশ মিনিট তোমাদের দেরি হয়েছে, সেই বিশ মিনিটের মধ্যেই মিডিয়া এই খবর নিয়ে তোলপাড় শুরু করে দিয়েছিলো। যদি চার জায়গায় একসাথে বিস্ফোরণ হত তাহলে তারা এই সুযোগটা পেত না, সবাই একসঙ্গে আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসত।

-আমাদের ক্ষমা করবেন মাস্টার ক্রুগো। আমাদের সত্যিই অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে।

-ফাইজান, তোমার কাজকর্মে আমি সন্তুষ্ট। তাই এত বড় একটা ভুল করা সত্ত্বেও তোমাকে আজ আমি ক্ষমা করছি। তবে মনে রেখো, এটাই তোমার শেষ সুযোগ।

-আমার মনে থাকবে মাস্টার ক্রুগো।

-আর এরপরেও যদি তোমার দ্বারা কোন ভুল হয়, তাহলে আশা করি আমার শাস্তি সম্পর্কে তুমি বেশ ভালোভাবেই অবগত আছ।

৯.

দীপের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো সে কোথায় আছে তা বুঝতে। বাঁ হাতটা চোখের সামনে তুলে হাতঘড়িতে সময় দেখলো সে। দুপুর একটা বেজে পাঁচ মিনিট। সে সাধারণত একটু দেরি করেই ঘুম থেকে ওঠে, কিন্তু তাই বলে এতটা দেরি তার কখনোই হয় না। গতরাতে সে ঘুমিয়েছে তিনটার পরে। বাকিরা আরও পরে ঘুমিয়েছিলো। তাই তাদেরও ঘুম ভাঙার কথা না। ডানপাশে তাকালো সে, যেখানে আবীর শুয়েছিলো। জায়গাটা ফাকা। কোথায় গেছে সে? সাইফ স্যারও এ ঘরেই ঘুমিয়েছিলেন, তাকেও দেখা যাচ্ছে না।

আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো দীপ। কয়েকেটা চাদর দলা পাকিয়ে বালিশ বানানো হয়েছে। মেঝেতে বিছানোর মত কিছুই পাওয়া যায় নি। তাই রাতে তাদের ঘুমাতে হয়েছে ফাকা মেঝেতেই। এভাবে ঘুমাবার অভ্যাস নেই দীপের, তাই সারা শরীর ব্যাথা করছে তার। উঠে দাড়িয়ে পা টিপে টিপে দরজার কাছে গেল সে। বাইরে বের হয়ে পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে দাড়ালো। ঐ ঘরটাতে জোনাকি ঘুমিয়েছিলো। দীপ দরজা দিয়ে উকি মেরে দেখলো জোনাকি এখনো ঘুমাচ্ছে। গতকাল বেশ ধকল গেছে বেচারির ওপর দিয়ে। যদিও ধকল সবার ওপর দিয়েই গেছে। কিন্তু তার চাইতেও বড় ব্যাপার হল দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তার কারণে রাতে কারোই সহজে ঘুম আসছিলো না। তবুও একটা সময় কীভাবে যেন সবারই চোখ লেগে এসছিলো।

জোনাকি যে ঘরটাতে ঘুমাচ্ছে সেই ঘরটা থেকে আরেকটু এগোলেই ছাদে যাওয়ার সিড়ি। আবীর আর সাইফ স্যারকে হয়ত ছাদেই পাওয়া যাবে, ভাবলো দীপ। ছাদের সিড়ির দিকে হাটা ধরল সে। তারপর সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

ছাদে উঠে দীপ দেখলো তার ধারণা আংশিক সঠিক। আবীর ছাদেই আছে, কিন্তু সাইফ স্যারকে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ছাদের রেলিং-এর ওপর ভর দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখছে আবীর, সেই সঙ্গে একমনে কী যেন ভাবছে। চুপচাপ আবীরের পাশে গিয়ে দাড়ালো দীপ, তারপর তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো। দেখতে পেলো বেশ খানিকটা দূরে রাস্তা দিয়ে শত শত লোক ধীর পায়ে হেটে কোথায় যেন যাচ্ছে।

"এরা যাচ্ছে কোথায়?" প্রশ্ন করল দীপ।

"সম্ভবত শাপলা চত্বর।" উদাস ভঙ্গিতে আবীর বলল।

হয়ত আবীরের কথাই ঠিক, লোকগুলো শাপলা চত্বরের দিকেই যাচ্ছে। কিন্তু শাপলা চত্বরে কেন? বিষয়টা পরিষ্কার না দীপের কাছে। শুধু দীপ কেন, কারো কাছেই পরিষ্কার না। কোন কিছুই পরিষ্কার না।

"ওহ! তোমরা এখানে?"

সাইফ স্যারের কণ্ঠ শুনে পেছন ফিরল দু'জন। আবীর বলল, "আমি তো ঘুম থেকে উঠে আপনাকে দেখতে না পেয়েই ছাদে এলাম আপনাকে খুজতে। ভাবলাম আপনি হয়ত ছাদে।"

"আপনি কোথায় গিয়েছিলেন স্যার?" দীপ জানতে চাইলো।

"উঠে দেখলাম ঘরে খাওয়ার মত কিছুই নেই। তাই কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতেই বেরিয়েছিলাম।" জবাবে সাইফ স্যার বললেন।

খাবারের কথা শুনতেই দু'জনেরই পেট খিদেয় চোঁ চোঁ করে উঠলো। আগের দিন সন্ধ্যায় শুধু কয়েকটা কলা আর পাউরুটি পেটে পড়েছিলো, তার পর থেকে এ পর্যন্ত আর কিছুই খাওয়া হয় নি।

"তোমাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?" দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললেন সাইফ স্যার, "একটা ফলের দোকানের দরজা ভেঙে বেশ কিছু তাজা ফল পাওয়া গেছে, এর বেশি আর কিছুই পাওয়া যায় নি। আপাতত এগুলো খেয়েই থাকতে হবে।"

"এই-ই অনেক বেশি স্যার।" ম্লান হেসে আবীর বলল, "দেশের যা অবস্থা!"

"আবীর! দীপ! তোমরা কী ছাদে?"
নীচে থেকে ভেসে এলো জোনাকির কণ্ঠ। ঘুম থেকে উঠে কাউকে দেখতে না পেয়ে সিড়ির কাছে চলে এসেছে সে।
"হ্যা, আসছি দাড়াও।" উত্তরে বলল আবীর।
সিড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন সাইফ স্যার, তার পেছন পেছন আবীর আর দীপও হাটতে শুরু করল সিড়ির দিকে। কিন্তু সিড়ি বেয়ে অর্ধেক পথ না নামতেই হঠাৎ তাদের কানে ভেসে এলো "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" শ্লোগান! সাইফ স্যার পেছন দিকে ঘুরে আবীর আর দীপকে পাশ কাটিয়ে আবার ছাদে উঠতে লাগলেন। আবীর আর দীপও গেল তার পেছনে।

ছাদের রেলিং-এর পাশে দাড়িয়ে তারা দেখলো, তাদের বিল্ডিং থেকে বেশ কিছুটা দূরে রাস্তা দিয়ে বিশ-পচিশজন লোক হেটে যাচ্ছে, তাদের মুখে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" শ্লোগান। নেশাগ্রস্তের মত করে শ্লোগান আউড়াচ্ছে তারা। আবীর চিনতে পারল লোকগুলোকে, আগের দিন এদেরকে অনুসরণ করেই তারা মতিঝিল শাপলা চত্বরে গিয়েছিল।
"গতকালকের সেই লোকগুলোই না?" জিজ্ঞেস করল জোনাকি। সে যে কখন নিঃশব্দে তাদের পাশে এসে দাড়িয়েছে তা তারা খেয়ালই করে নি।
"হুমম। তাই তো দেখছি।" আবীর জবাব দিল।
"মনে হচ্ছে যেন ওয়ার্কশপ চলছে শাপলা চত্বরে!" সবিস্ময়ে জোনাকি বলল, "এদেরকে কোন জায়গা থেকে কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠানো হচ্ছে, সেই শেখানো জিনিস আবার তারা শাপলা চত্বরে গিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মগজে গুজে দিচ্ছে!"
"নীলকণ্ঠ দেবনাথের ভাইরাস মানুষকে এক নিম্নশ্রেণীর জীবে পরিণত করেছে।" বিড়বিড় করে বললেন সাইফ স্যার, "এদেরকে যা শেখানো হচ্ছে এরা তাই করছে, এদের দিয়ে যা করানো হচ্ছে এরা তা করছে।" তার কথায় সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল

বাকি তিনজন। প্রফেসর সাইফ আবার বললেন, “কোনভাবে যদি জানা যেত যে কোন জায়গা থেকে এদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, তাহলেও অনেক কাজে দিত।”
একটু ভেবে আবীর বলল, “দেড় কিংবা দু’ঘণ্টার মধ্যেই এরা আবার এই পথ দিয়েই ফিরবে। তখন এদের ফলো করে......”

সাইফ স্যার অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালেন আবীরের দিকে। বলে কী এই ছেলে!
এদেরকে অনুসরণ করে কোথায় গিয়ে পৌছাবে তা না জানলেও প্রফেসর সাইফ অন্তত এটুকু বুঝতে পারছেন যে জায়গাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আর সেখানে একবার গেলে জীবিত ফিরতে পারবে কিনা, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রফেসর সাইফ একবার আবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন যে সে আসলে মজা করছে কিনা। কিন্তু না, তার চোখে মুখে মজা করার কোন চিহ্নমাত্র নেই।
“হ্যা, সেটা করা যায়।” প্রফেসর সাইফ রাজুকে আরও অবাক করে দিয়ে বলল জোনাকি।
“কিন্তু কীভাবে?” প্রশ্ন করল দীপ, “ওরা তো আমাদের চট করে ধরে ফেলবে!”
আবীর মাথাটা একটু চুলকে বলল, “বেগুনী রঙের একজোড়া কন্ট্যাক্ট লেন্স হলে ছদ্মবেশে ওদের দলে ঢুকে পড়া যেত।”
“ইউরেকা!!!”
জোনাকির উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে সবগুলো চোখ একসঙ্গে তার দিকে ঘুরে গেল। তার চোখ দু’টো চকচক করছে। সে উত্তেজিত স্বরে বলল, “আমার কাছে আছে! আমার কাছে আছে বেগুনী রঙের লেন্স! তাও আবার তিন জোড়া!”
“সত্যি?” আবীর বলল অবিশ্বাসের সঙ্গে, প্রয়োজনের মুহুর্তে কোন কিছু না চাইতেই পেয়ে যাওয়ার ঘটনা এই প্রথম ঘটল।
“হ্যা।” জবাবে বলল জোনাকি, “গতবছর কলেজে একটা মঞ্চ নাটকে আমি আর আমার দুই চাচাত বোন মিলে কাজ করেছিলাম। সেখানে আমরা তিনজনই ডাইনীর

রোল প্লে করেছিলাম, যাদের চোখ ছিল বেগুনী রঙের। সেসময় আমরা যে কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করেছিলাম সেগুলো এখনো আছে।"

"এখন কোথায় সেগুলো?" অধৈর্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল আবীর।

"বাসায়," জোনাকি বলল, "গিয়ে নিয়ে আসা যাবে।"

এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথা শুনছিলেন সাইফ রাজু, নিজের কানকে তিনি এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না। একটা দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "তোমরা কি বুঝতে পারছ তোমরা কী করার কথা বলছ?! তোমরা যা করতে চাইছ তার পরিণতি কী হতে পারে তা কি তোমরা বুঝতে পারছ না নাকি বুঝতে চাইছ না?"

"স্যার, আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা যা করতে যাচ্ছি তাতে জীবনের ঝুকি আছে।" জবাবে আবীর বলল, "কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। ওদের পিছু নিলে হয়ত আমরা এই সমস্যার একটা সমাধানও পেয়ে যেতে পারি।"

প্রফেসর সাইফ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই জোনাকি বলল, "আবীর ঠিকই বলেছে। এভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে এমনিতেও তো আমাদেরকে মরতেই হবে। কারণ আজ যদি আমরা মৃত্যুর কাছে না যাই, তাহলে কাল মৃত্যু আমাদের কাছেই আসবে।"

"ঠিক আছে।" হার মানলেন সাইফ স্যার। তিনি বললেন, "তবে তাই হবে। কিন্তু তোমাদেরকে কথা দিতে হবে যে তোমরা আমাকে না জানিয়ে কিংবা আমার নিষেধ অমান্য করে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যাবে না।"

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তিনজনের মুখ। মাথা নেড়ে তারা সম্মতি জানালো।

"আমি তাহলে ওগুলো নিয়ে আসি?" অনুমতি চাইলো জোনাকি।

"দাড়াও জোনাকি।" বাধা দিয়ে বললেন সাইফ রাজু, "তুমি একা যাবে না। আমিও আসছি তোমার সঙ্গে।"

"স্যার, আমরাও আসি?" অনুরোধের সুরে বলল আবীর।

"না।" সাইফ স্যার বললেন, "সামান্য কয়েকটা জিনিস আনতে এত লোকের যাওয়ার কোন দরকার নেই। এতে বরং ঝামেলা বাড়বে।"

বাধ্য ছেলের মত মাথা নাড়ল আবীর আর দীপ। কী আর করা!

****

“এটাই তোমার বাসা?” রাস্তার পাশের তিনতলা বাড়িটির দিকে দেখিয়ে জোনাকিকে জিজ্ঞেস করলেন ড. সাইফ রাজু।
“জ্বী স্যার, এটাই।” জবাবে বলল জোনাকি।
আশেপাশে কেউ আছে কিনা তা একবার দেখে নিলেন সাইফ স্যার। না, কেউ নেই। তারপর বললেন, “তাহলে আর দেরি করে কাজ নেই, যা নিতে এসেছি তা নিয়ে জলদি সরে পড়তে হবে। কখন আবার কারা এসে পড়বে!”
“চলুন স্যার।” বলে দ্রুত বাড়ির দরজা লক্ষ্য করে হাটতে শুরু করল জোনাকি, তার সঙ্গে সাইফ স্যারও।

দরজাটা হা করে খোলা, সেই দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখা গেল ছোটখাট একটা বসার ঘর। ঘরটিতে আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছুই নেই, কিন্তু যা আছে তার জন্যেও জায়গা কম পড়েছে এই ছোট্ট ঘরটিতে। জায়গার অভাবে আসবাবপত্রগুলো একটির সঙ্গে আরেকটি গা ঘেষে রাখা হয়েছে। অন্যান্য সময় কেমন থাকে জানা নেই, কিন্তু এখন ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন লাগছে। ঘরের ভেতর থেকে বোঝার কোন উপায়ই নেই এখন দিন নাকি রাত!

সদর দরজার ডানদিক দিয়ে একটা সিড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে।সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যেতে লাগল জোনাকি। তাকে অনুসরণ করে উঠে গেলেন প্রফেসর সাইফ রাজু। ওপরে উঠতেই দেখা গেল হাতের ডানদিকে পর পর তিনটা দরজা। একটা দরজা থেকে আরেকটা দরজার দূরত্ব খুবই কম। বোঝাই যাচ্ছে যে এই ঘরগুলোও বেশ ছোট ছোট। সাইফ রাজু অবাক হয়ে ভাবলেন, এত ছোট ঘরে মানুষ থাকে কেমন করে?!

তৃতীয় দরজাটা খোলা, সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো জোনাকি। এটা সম্ভবত তার ঘর। তার পেছন পেছন সাইফ রাজুও ঢুকলেন। ঘরের একপাশে দেয়াল ঘেষে ছোটখাট একটা বিছানা, বিছানার পাশেই একটা পড়ার টেবিল। ঘরে আসবাব বলতে শুধু এতটুকুই। পড়ার টেবিলের পাশে একটা জানালা, সেখান দিয়ে সূর্যের আলো আসছে। টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ার খুলল জোনাকি। ড্রয়ারের ভেতরে হাতড়ে হাতড়ে খুজতে লাগল সে।

“তুমি নিশ্চিত যে এখানেই রেখেছিলে।” সাইফ স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

“আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি ওগুলো শেষবার এই ড্রয়ারেই দেখেছিলাম।” খুজতে খুজতে বলল জোনাকি। কিন্তু ড্রয়ারের সবকিছু এলোমেলো করেও কিছুই পাওয়া গেল না। এক পর্যায়ে জোনাকি যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিল, তখনই হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। “এইতো পেয়েছি!”

“গুড!” খুশি হয়ে উঠলেন সাইফ স্যার, বললেন, “এবার তাহলে যাওয়া যাক।”

“এক মিনিট স্যার।” ঘর থেকে বের হতে হতে জোনাকি বলল, “পাশের ঘরটা আমার চাচাত বোনদের, ওখান থেকে মেকআপ বক্সটা নিতে হবে। ছদ্মবেশ নেয়ার সময় ওটা লাগবে।”

“তাড়াতাড়ি করো।” তাড়া দিয়ে বললেন সাইফ স্যার।

জোনাকি দ্বিতীয় ঘরের দরজাটায় হালকা ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। দেখা গেল এই ঘরটা তুলনামূলকভাবে বড়, আসবাবপত্রও জোনাকির ঘরের চাইতে বেশিই আছে। ঘরের একপাশে একটা ওয়ার্ডরোব, সেটার কাছে এগিয়ে গেল জোনাকি। ওপরের দিক থেকে দ্বিতীয় ড্রয়ারটা খুলল। সেখানে না পেয়ে তৃতীয়টা খুলল।

“কী? পেয়েছ?” অধৈর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সাইফ স্যার।

“না স্যার, দু’টো ড্রয়ারের একটাতেও তো পাওয়া যাচ্ছে না!” হতাশ ভঙ্গিতে বলল জোনাকি।

জোনাকিকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন সাইফ স্যার। তিনি বললেন, “এখানে ছাড়া আর কোথায় রাখতে পারে বলে তোমার মনে হয়? সেসব জায়গা খুজে দেখতে হবে।”

“রাখলে তো এখানেই রাখার কথা।” হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল জোনাকি।

“তারপরেও আশেপাশে অন্যান্য জায়গাগুলোতে খুজে দ্যাখো।” বলে ঘরের চারদিকে চোখ বুলাতে লাগলেন সাইফ রাজু। এক পর্যায়ে কী মনে করে যেন বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি, তার পেছন পেছন জোনাকিও। বিছানার একপাশে কাথা, বালিশ সব গুছিয়ে রাখা। সেগুলো সরালেন সাইফ স্যার, দেখলেন সেগুলোর নিচে আছে কিনা। নেই। তারপর বিছানার তোষক উঠালেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই জোনাকির চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

“এইতো মেকআপ বক্স! এখানে লুকিয়ে রেখেছিলো তাহলে!”

সোনালি রঙের বাক্সটা হাতে তুলে নিল জোনাকি। একবার খুলে দেখল ভেতরে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। হ্যা, সব ঠিকই আছে।

“এবার চলো তাহলে।” তাড়া দিলেন সাইফ স্যার।

কিন্তু দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাড়ালেন তিনি। স্থির দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন দরজার দিকে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দরজার দিকে তাকাতেই রক্ত হিম হয়ে গেল জোনাকির। দরজায় দাড়িয়ে একজন লোক শীতল দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার বেগুনী রঙের চোখ যেন অঙ্গারের মত জ্বলজ্বল করছে! আতঙ্কে হাত পা অবশ হয়ে এলো জোনাকির যখন সে দেখল লোকটি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আড়চোখে সাইফ স্যারের দিকে তাকালো সে। দেখল সাইফ স্যারও জায়গায় দাড়িয়ে আছেন, তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

লোকটা তাদের সামনে এসে দাড়ালো। আস্তে আস্তে দু’হাত বাড়িয়ে দিতে লাগল তাদের দিকে। এক পর্যায়ে লোকটির দু’হাত যখন জোনাকি আর সাইফ স্যারের প্রায় গলা পর্যন্ত চলে এসছে, তখন জোনাকির হঠাৎ কী হল কে জানে, সে লোকটির ঠিক

চোখের দিকে থুতু ছুড়ে দিল! আর সাথে সাথে লোকটি দু'হাতে তার মুখ চেপে ধরে গগনবিদারী আর্তনাদ জুড়ে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার চিৎকারে যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন প্রফেসর সাইফ, তিনি জোনাকির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, "জোনাকি পালাও!" তারপর নিজেই জোনাকির বা হাত ধরে হ্যাচকা টান দিলেন। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল জোনাকি, পড়ে যেতে গিয়েও শেষটায় সামলে নিল।

সাইফ স্যারের সাথে সাথে দৌড়ে সিড়ি দিয়ে নামলো জোনাকি। পেছন থেকে শুনতে পেল সেই লোকটি চিৎকার করে বলছে, "বাচাও! আমাকে বাচাও! নিয়ে যাও আমাকে!!" সাইফ স্যার কিংবা জোনাকি কেউ-ই সেদিকে কান দিল না। হতে পোর এটা লোকটার একটা চাল! তারা দৌড়ে বাসা থেকে বের হল। রাস্তায় নেমে কোনদিকে যাবে তা ঠিক করে নেয়ার জন্য এক সেকেন্ডের জন্য থামল, তারপর আবার দৌড়।
"আআআহহহহ!!"

জোনাকির আর্তনাদ শুনে থেমে দাড়িয়ে পেছন ফিরলেন প্রফেসর সাইফ। দেখলেন জোনাকি রাস্তার ওপর হোচট খেয়ে পড়েছে। ডান পায়ের হাটু চেপে ধরে গোঙাচ্ছে সে, উঠে দাড়াতে পারছে না। মারাত্মক চোট লেগেছে পায়ে, বোঝা যাচ্ছে। প্রফেসর সাইফ ছুটে গেলেন জোনাকির কাছে। তার পাশে হাটু গেড়ে বসলেন তিনি।
"দেখি।" বললেন সাইফ স্যার, "হাতটা সরাও, দেখি কী হয়েছে।"
হাত সরালো জোনাকি। ড. সাইফ তার পা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন, বোঝার চেষ্টা করলেন কোথাও ভেঙেছে কিনা। এক জায়গায় চাপ পড়তেই জোনাকি ব্যাথায় গুঙিয়ে উঠলো।
"স্যার," গোঙাতে গোঙাতে বলল জোনাকি, "এই জিনিসগুলো নিয়ে আপনি চলে যান, কেউ এসে পড়লে তখন দুইজন একসাথে ধরা পড়ে যাব।" তার হাতের জিনিসগুলো সাইফ স্যারের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

"বোকার মত কথা বোলো না!" ধমকে উঠলেন সাইফ স্যার। বোঝা গেল তিনি সত্যি সত্যিই রেগে গেছেন। তাই চুপ করে গেল জোনাকি।

এসময় একটা গাড়ি থাকলে সবচাইতে ভালো হত। কিন্তু দেশের এই অবস্থায় কোন আস্ত যানবাহন রাস্তায় দেখতে পাওয়ার আশা করাটাও বোকামী! তবুও খুব আশা নিয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন প্রফেসর। এবং তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, যখন তিনি দেখলেন খানিকটা দূরেই রাস্তার ওপর একটা রিকশা কাত হয়ে পড়ে আছে।

সাইফ রাজু জীবনে কখনও ঈশ্বরকে ডাকেন নি। কিন্তু আজ তিনি একদম মন থেকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন।

১০.

“তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?!” আবীরকে উদ্দেশ্য করে খানিকটা ধমকের সুরেই বললেন ড. সাইফ রাজু।
“স্যার, আমি যা বলছি ঠিকই বলছি।” ঠাণ্ডা গলায় বলল আবীর, “আপনার যাওয়া উচিত হবে না। ওদেরকে ফলো করে আমি আর দীপ যাব।”
“তোমরা বুঝতে পারছ না,” আবীরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন সাইফ রাজু, “জীবনটা কোন এডভেঞ্চার উপন্যাস না! আমরা এখনও জানি না যে ওদেরকে ফলো করে আমরা কোথায় গিয়ে পৌছাব। ওখানে গিয়ে তোমাদের দু’জনের যদি কিছু হয়ে যায়?!”

আবীর আগের মতই স্বাভাবিক স্বরে বলল, “স্যার, আমার ধারনা আমাদের মত আরও অনেকেই এখনও সুস্থ আছে। তাই আমাদের কিছু একটা হয়ে গেলেও আমাদের মত আরও কয়েকজনকে আপনি পেয়ে যাবেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের পাশে একজন বিজ্ঞানীকে খুবই দরকার। তাই আপনার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আসলেই অনেক বড় রকমের ক্ষতি হয়ে যাবে।” একটু থামল আবীর। তারপর আবার বলতে শুরু করল, “আর প্রফেসর নীলকণ্ঠ শেষবার শুধুমাত্র আপনার সাথেই যোগাযোগ করেছিলেন। আমার ধারনা এর পেছনে অবশ্যই কোন না কোন বিশেষ কারণ আছে। তাই আপনার বেচে থাকাটা সবচাইতে বেশি জরুরি।”

দীপ এতক্ষণ চুপচাপ দাড়িয়ে সব শুনছিলো। এতক্ষণে সে মুখ খুলল, “স্যার, আবীর ঠিকই বলছে, আমরা দু’জন গেলেই ভাল হবে। আর তাছাড়া আপনি পুরোটা পথ রিকশায় করে জোনাকিকে নিয়ে এসেছেন, আপনার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। তাই আপনার এখন বিশ্রাম নেয়া উচিত।”

কী মনে করে যেন জোনাকির দিকে তাকালো আবীর। মুখ ভার করে বসে আছে সে। তার নিজেকে নিজের কাছেই খুব ছোট লাগছে, মূলত দু'টো কারণে। প্রথমত, সে আবীর আর দীপের সাথে যেতে পারছে না পায়ের প্রচণ্ড ব্যাথার কারণে। আর দ্বিতীয়ত, সাইফ স্যার পুরোটা পথ নিজে রিকশা চালিয়ে তাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন- একথা সে যতবার ভাবছে ততবারই লজ্জায় কুকড়ে যাচ্ছে। এখন আবার দীপের মুখে সেই ঘটনার কথা শুনে চোখ নামিয়ে ফেলল সে।

আবীর সাইফ স্যারের দিকে তাকিয়ে আবারও বলল, "আর তাছাড়া বড় মাপের মানুষদের সহজে লুকানোও যায় না। আমরা ওদেরকে ফলো করে যে জায়গায় গিয়ে পৌছাব, সেখানে কেউ ছদ্মবেশের আড়ালে লুকানো আপনাকে চিনেও ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি আর দীপ গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম, কারণ আমাদের দু'জনকে কেউ চিনবে না।"

একটা দীর্ঘঃশ্বাস ছাড়লেন ড. সাইফ। হার মানতে বাধ্য হলেন তিনি। হার না মেনেই বা উপায় কী? ছেলেগুলো তো ঠিকই বলছে, এখন তার বেঁচে থাকাটা সবচাইতে বেশি জরুরী। এখন আবেগপ্রবণ হওয়ার সময় না, এখন বাস্তবতাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

"ঠিক আছে।" ড. সাইফ বললেন, "কিন্তু মনে থাকে যেন, তোমরা আগ বাড়িয়ে কোন রকম ঝুকি নিতে যাবে না।"
পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল আবীর আর দীপ, তারপর সাইফ স্যারের দিকে তাকিয়ে হ্যা সূচক মাথা নাড়ল।

সাইফ স্যার কয়েক মুহুর্ত দাড়িয়ে কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, "এক মিনিট দাড়াও।" বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালেন সাইফ স্যার। তারপর যন্ত্রপাতি বোঝাই টেবিলটির কাছে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুলে কী যেন খুজতে লাগলেন। কিছুক্ষণ

খোজার পর মনে হল জিনিসটা পেয়ে গেলেন। সেটা হাতে নিয়ে কী যেন টেপাটেপি করলেন, মনে হল কিছু একটা ঠিক করছেন। তারপর সেটা নিয়ে ফিরে এলেন। আবীর আর দীপ দেখলো, সাইফ স্যারের হাতে বোতামের মত দেখতে কিছু একটা। সাইফ স্যার সেটা আবীরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এটা তোমার শার্টে লাগিয়ে নাও।"

"এটা কী?" হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিতে নিতে আবীর জিজ্ঞেস করল।

"এটা একটা ক্যামেরা।" সাইফ স্যার বললেন, "অনেক সময় অনেক কিছু মানুষের চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু ক্যামেরার চোখ এড়ায় না।"

ক্যামেরাটা নিজের শার্টের সঙ্গে লাগিয়ে নিলো আবীর। তারপর টেবিলের ওপর রাখা জোনাকির মেকআপ বক্সের আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিল। নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেই ঘাবড়ে গেল সে! মুখটা একদম রক্তশূন্যের মতই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। ভালোভাবে লক্ষ্য না করলে ওদের সাথে কোন পার্থক্যই চোখে পড়ার কথা না। বেশ পাকা হাতে তাদের দু'জনের মেকআপ করে দিয়েছে জোনাকি। দীপও আয়নায় একবার নিজেকে দেখে নিল, কোথাও কোন খুত আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। না, কোন খুত নেই।

"পাকিস্তান জিন্দাবাদ! পাকিস্তান জিন্দাবাদ!"

শ্লোগানের শব্দ ভেসে এল রাস্তা থেকে। আবীর তাকালো দীপের দিকে। দীপ ঢোক গিলল।

সাইফ স্যার শুকনো গলায় বললেন, "এবার তোমাদের বেরোতে হবে।"

****

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আবীর তাকিয়ে আছে তাদের কলেজ ভবনটির দিকে। সে স্বপ্নেও ভাবে নি যে এদেরকে অনুসরণ করতে করতে তারা এখানে চলে আসবে। আবীর ভাবলো, এরা হয়ত কলেজ ভবনটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। কিন্তু না, তারা

কলেজের গেট দিয়ে লাইন ধরে ভেতরে ঢুকছে! গেটের দু'পাশে কালো পোশাক পরা দু'জন বিশালদেহী লোক দাড়িয়ে আছে প্রহরীর ভঙ্গিতে। লোক দু'টোকে দেখে বাংলাদেশী মনে হচ্ছে না, খুব সম্ভবত পাকিস্তানী।

আবীর আর দীপ লোকগুলোর সঙ্গে ধীর পায়ে হাটতে হাটতে কলেজের গেট দিয়ে ঢুকলো। তারপর লোকগুলোকে অনুসরণ করে আবার সামনের দিকে হাটতে লাগল। লোকগুলো কলেজের হলরুমের দিকে যাচ্ছে, বুঝতে পারল আবীর। হলরুমের কাছাকাছি যেতেই দেখা গেল হলরুমের দরজায় দু'পাশে কালো পোশাক পরা দু'জন বিশালদেহী লোক দাড়ানো, তাদের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। ভাইরাস আক্রান্ত লোকগুলো হলরুমে ঢুকতে শুরু করল, সঙ্গে আবীর আর দীপও। হলরুমের ঠিক মাঝখানে গিয়ে তিন সারিতে দাড়িয়ে গেল সবাই।

হলরুমটা বেশ বড়। উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে দু'টো করে দরজা। পূর্বদিকে স্টেজ, স্টেজের দুই দিকে দু'টো দরজা। পূর্বদিকের দেয়ালে একটা মনিটর দেখা যাচ্ছে, তার সামনে একটা টেবিলের ওপর একটা কী-বোর্ড। এটা আগে ছিল না। স্টেজের দু'পাশে কালো পোশাকের দু'জন অস্ত্রধারী ব্যক্তি দাড়ানো। তারা একটু পর পর নিজেদের মধ্যে ঊর্দুতে কিছু একটা নিয়ে কথা বলছে, বার বার স্টেজের দরজার দিকে তাকাচ্ছে। ওপরে সারি সারি অনেকগুলো ফ্যান ঝুলছে, কিন্তু সবকয়টাই বন্ধ। চলছে শুধুমাত্র স্টেজের ওপরের তিনটা ফ্যান। আবীরের মনে হচ্ছে যেন গরমে সে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে! অন্যদের দিকে আড়চোখে তাকালো সে। দেখলো, কারো কোনো বিকার নেই!

অনেকক্ষণ নীরবে কাটলো। তারপর হঠাৎ পায়ের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র গার্ড দু'জন সোজা হয়ে দাড়ালো। আবীরও কান খাড়া করল। পায়ের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। যার বা যাদের জন্যে অপেক্ষা, পায়ের শব্দ যে তাদেরই তাতে কোন

সন্দেহ নেই। অবশেষে সবার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্টেজের বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলো তারা তিনজন।

সর্বপ্রথম যে ঢুকলো, সে এক বিশালদেহী ব্যক্তি। উচ্চতা ছয় ফুটেরও বেশি হবে, গায়ের রং বেশ ফরসা। মুখ লম্বাটে, চোখ দু'টো ছোট ছোট, খাড়া নাক; নাকের নিচে রীতিমত শাণ দেওয়া গোফ! তার পরনে জলপাই রঙের পাঞ্জাবী, মাথায় পশমী টুপি। বোঝাই যাচ্ছে লোকটি পাকিস্তানী। আবীর লক্ষ্য করল, লোকটি তার ডানহাতে রিমোট কন্ট্রোলের মত একটা কিছু ধরে রেখেছে। সেটাতে কোন বাটন দেখা যাচ্ছে না, শুধু একটা ফিঙ্গার প্যাড আছে। লোকটির পেছন পেছন যে দুইজন ঢুকলো তাদের একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী সোলায়মান মোল্লা। চার বছর আগে সে আন্ডারগ্রাউন্ড হয়েছিল, তারপর থেকে এতদিন তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। আজ এখানে এসে যে এ ধরনের কারো দেখা পাবে, এরকমটা অবশ্য আবীর আগেই অনুমান করেছিল।

কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেখার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত ছিল না আবীর, তাই তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো। সে আশা করেছিল এখানে হয়ত রায়হান স্যারকে দেখতে পাবে। কিন্তু না, স্টেজের ওপর সেই পাকিস্তানী ব্যক্তি এবং সোলায়মান মোল্লার সঙ্গে যে ব্যক্তিটি দাড়িয়ে আছেন, তিনি রায়হান স্যার নন। তিনি রসায়নের অধ্যাপক রাজ্জাক স্যার।

স্টেজের সামনে এসে হাত দু'টো পেছনে নিয়ে দাড়ালো পাকিস্তানী লোকটি, তার পেছনে সোলায়মান মোল্লা এবং রাজ্জাক স্যার। ক্রুর হাসি খেলে গেল পাকিস্তানী লোকটির মুখে। গমগমে স্বরে সে সবার উদ্দেশ্যে বলল, "আ গায়ে সব লোক?"
সম্মোহিতের মত করে সবাই একসঙ্গে বলল, "জ্বী হা জনাব।"
"আজ কে পাঠ আচ্ছে তারে সে পড়হাকে আয়া না?"
"জ্বী হা জনাব।"

পাকিস্তানী লোকটি উর্দু ভাষায় একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে, আর ভাইরাস আক্রান্ত লোকগুলো সম্মোহিতের মত করে সেসব প্রশ্নের উত্তর উর্দুতেই দিয়ে যাচ্ছে। কেউ খেয়াল করল না, রাগে মুখ শক্ত হয়ে গেছে আবীরের। তার হাত আপনা আপনিই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড রাগে তার মাথায় যেন আগুন ধরে যাচ্ছে, অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখলো সে।
"বিপ বিপ বিপ! বিপ বিপ বিপ!!"

"বিপ বিপ" শব্দটা কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারল না আবীর। মনে হচ্ছে যেন কোন কিছুর সংকেত। শব্দটা শোনা যেতেই স্টেজের ওপরের তিনজন পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল, তাদের মধ্যে একধরনের চাঞ্চল্য দেখা গেল। পাকিস্তানী লোকটি মনিটরের দিকে মুখ করে দাড়ালো। তারপর টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল সে, তার পেছন পেছন বাকি দু'জনও। লোকটি কী-বোর্ডে কয়েকটা টোকা দিতেই মনিটরের স্ক্রীণে ভেসে উঠলো এক মুখোশধারীর ছবি।

"মাস্টার ক্রুগো," পাকিস্তানী লোকটি স্ক্রীণের মুখোশধারীর সামনে মাথা নত করে ইংরেজীতে বলল, "এ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনি আমাদের স্মরণ করেছেন।"
মুখোশধারী ব্যক্তি, যার নাম মাস্টার ক্রুগো, সে মেঘস্বরে ইংরেজীতে যা বলল তার বাংলা অর্থ দাড়ায়, "একই সাথে তোমাদের দুর্ভাগ্যও।"
"কেন মাস্টার ক্রুগো?" পাকিস্তানী লোকটি যেন কিছুটা ঘাবড়ে গেল। ভীত স্বরে সে বলল, "আমাদের কি কিছু ভুল হয়েছে?"
মাস্টার ক্রুগো গমগমে স্বরে বলল, "তোমরা নিজেদেরকে হাস্যকর করে ফেলেছ ফাইজান খান! তোমাদের তো বাংলাদেশে গিয়ে রাজত্ব করবার কথা ছিল। কিন্তু তোমরা দেখছি সেখানে পাঠশালা খুলে বসেছ!"

পাকিস্তানী লোকটি, যার নাম ফাইজান খান, সে হাত কচলাতে কচলাতে কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, “মাস্টার ক্রুগো, আপনি তো জানেন, এই বাঙালিদেরকে আঙুলের ইশারায় নাচাবার এই সুযোগটার জন্যে আমরা কতকাল ধরে অপেক্ষা করেছি। এদের মুখ দিয়ে উর্দু ভাষা বলানো, এদের মুখে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ শোনা- এসব তো আমাদের পূর্বপুরুষদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। আজ পঞ্চান্ন বছর পর যখন স্বপ্ন পূরণের এমন একটা সুযোগ পেয়েছি....”
“স্বপ্ন পূরণ অনেক হয়েছে।” ফাইজান খানকে থামিয়ে দিয়ে বলল মাস্টার ক্রুগো, “এবারে কাজের কথা বলো।”

ফাইজান খান বলতে শুরু করল, “দেশের প্রত্যেক জেলায় জেলায় আমাদের লোক পৌছে গেছে মাস্টার ক্রুগো। চৌষট্টিটি জেলায় চৌষট্টি জন। প্রত্যেক জেলার দায়িত্বে একজন করে নিয়োজিত করা হয়েছে, যাদের ইশারায় সেখানকার সবাই চলবে। আর তারা চলবে আমার ইশারায়।”
“ভালো।” মাস্টার ক্রুগো আগের মতই গম্ভীর স্বরে বলল, “বেশ ভালো। তোমাদের সরকার গঠন হয়ে গেছে তাহলে। কিন্তু বাতাসে ভাইরাসের প্রভাব যখন কমে আসবে, তখন যে এই বাধ্য প্রাণীগুলো অবাধ্য হয়ে উঠতে শুরু করবে সেটা মাথায় আছে তো?”
“মাথায় আছে মাস্টার ক্রুগো।” মুচকি হেসে বলল ফাইজান খান। সে তার ডানহাতে ধরা রিমোট কন্ট্রোলটি দেখিয়ে বলল, “এরা অবাধ্য হয়ে ওঠার আগেই এই রিমোট কন্ট্রোলের একটি মাত্র ইশারায় একসঙ্গে রাজধানীর চারটি জায়গায় বিস্ফোরণ হবে, আর সেই চারটি জায়গা থেকে ভাইরাস আবার সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে।”
“চমৎকার।” সন্তুষ্টি ঝরে পড়ল মাস্টার ক্রুগোর কণ্ঠে।
“আর এরা হচ্ছে আমাদের সেই গিনিপিগ, যাদের ওপর আমরা সর্বপ্রথম এই ভাইরাসের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করেছিলাম।” ভাইরাস আক্রান্তদের দিকে দেখিয়ে বলতে লাগল ফাইজান, “সারাদেশে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার আগে আমরা আপনার

কথামতই আলাদাভাবে পঁচিশজনের ওপর এই ভাইরাস প্রয়োগ করেছিলাম। সেই পঁচিশজনকে আমরা ভাইরাস আক্রান্ত অবস্থায় যা যা শিখিয়েছি তারা তাই শিখেছে। এখন সেই একই বাণী এরা আবার অন্য সবাইকে শেখাচ্ছে!"

"ফাইজান খান," শীতল গলায় বলল মাস্টার ক্রুগো, "তোমার ঐ হাস্যকর পাঠশালার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই।"

ফাইজান খান যেন একটু মিইয়ে গেল। মাস্টার ক্রুগো আবার বলতে শুরু করল, "এখন পৃথিবীর চৌদ্দটি দেশ আমাদের হাতের মুঠোয়। আমাদের মতের বাইরে যাওয়ার সামর্থ্য এরা হারিয়েছে। এই চৌদ্দটি দেশের বোধশক্তিহীন প্রাণীগুলোর মধ্য থেকে আর কোন বিপ্লবী আমাদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। এখন আমরা এদেরকে যেকোন কাজে ব্যবহার করতে পারি। এরা তাই করবে যা আমরা চাইব।"

"জয় মাস্টার ক্রুগোর জয়!" দু'হাত তুলে বলে উঠলো ফাইজান খান, তার সঙ্গে বাকি দু'জনও।

"কিন্তু একটা জায়গায়ই সমস্যা রয়ে গেছে," গম্ভীর স্বরে বলল মাস্টার ক্রুগো, "যেটা জানানোর জন্যে আজ তোমাদের ডেকেছি।"

চিন্তার ছাপ পড়ে গেল তিনজনের মুখেই। ফাইজান খান কৌতুহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "কী সমস্যা মাস্টার ক্রুগো?"

"সমস্যাটা আমাদের ভাইরাসের।" মাস্টার ক্রুগো বলল, "কোন একটা অজানা কারণে আমাদের ভাইরাস কিছু সংখ্যক মানুষের ওপর কার্যকর হচ্ছে না। এবং দেখা গেছে যে এই ভাইরাস তাদের ওপরই কাজ করছে না যাদের রক্তে অক্সিজেনের তারতম্য আছে, কিংবা দেহে কোন কৃত্রিম উপাদান আছে।"

ফাইজান খান যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে বলল, "এ-এরকমটা হওয়ার কারণ কী মাস্টার ক্রুগো?"

“সেই কারণটাই আমাদের বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করছে।” মাস্টার ক্রুগো বলল, “ভাইরাসের কোথাও একটা অপূর্ণতা রয়ে গেছে। সেই অপূর্ণতাটা কোথায় সেটাই দেখার বিষয়।”

ভয়ার্ত কণ্ঠে ফাইজান খান বলল, “এখন তাহলে কী হবে মাস্টার ক্রুগো? ওরা- মানে যারা এখনও সুস্থ আছে, তারা যদি আমাদের প্রজেক্ট পাইয়ের ওপর পানি ঢেলে দেয়......”

ফাইজান খানকে থামিয়ে মাস্টার ক্রুগো বলতে শুরু করল, “এরকম লোকের সংখ্যা ভাইরাস আক্রান্তদের চাইতে বেশি হওয়ার কথা না। তাই ভাইরাস আক্রান্তদের দিয়েই এদের গুড়িয়ে দাও।”

“তাহলে আমি আগামীকালই এদেরকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দেব মাস্টার ক্রুগো।” বলল ফাইজান খান।

“পাঠাও।” বরাবরের মতই গম্ভীর স্বরে বলল মাস্টার ক্রুগো, “তোমাদের হাতে সাত দিন সময়, এরই মধ্যে সব সুস্থ মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া চাই।”

****

“আমরা যাচ্ছি কোথায়?”

দীপের প্রশ্নের জবাবে আবীর বলল, “কেমিস্ট্রি ল্যাব। আমার ধারণা ওখানে আমরা কোন না কোন সূত্র পেয়ে যেতে পারি, যা আমাদের অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।”

“ওখানে গেলে কী পাবে বলে মনে হয়?” আবারও প্রশ্ন করল দীপ।

“আগে যাই। তারপর দেখা যাবে।” দীপের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আবীর বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সেই তখন থেকেই একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছে ছেলেটা।

কেমিস্ট্রি ল্যাবের দরজা খোলাই আছে। হয়ত কেউ এখানে আসতে পারবে না ভেবেই ভেতরে নিরাপত্তা ব্যবস্থার তেমন কড়াকড়ি রাখা হয় নি। যদিও এখন তারা জানে যে

কিছু সংখ্যক মানুষ ভাইরাসের প্রভাব থেকে মুক্ত। তাই এরপরে স্বাভাবিকভাবেই তারা কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেবে। আবীর মনে মনে ভাবলো, সে আর দীপ একদম সঠিক সময়েই এসেছে।

দরজা দিয়ে ল্যাবের ভেতরে ঢুকলো আবীর। তাকে অনুসরণ করে ঢুকতে ঢুকতে দীপ বলল, "আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"
"সেই কখন থেকেই তো একটার পর একটা কথা জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছ!" একটা দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে আবীর বলল, "করো।"
দীপ ভয়ে ভয়ে বলল, "আমরা এখানে ঢুকে তো গেলাম, কিন্তু বের হব কেমন করে?"

এই প্রশ্ন আবীরের মাথায়ও ঘুরঘুর করছে সেই শুরু থেকেই। এখনও তার মাথায় এই একই প্রশ্ন অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে, এখান থেকে তারা বের হবে কেমন করে? যদিও এই প্রশ্নের কোন উত্তর আবীরের কাছে নেই, তবুও দীপকে আশ্বস্ত করার জন্যে সে বলল, "চিন্তা কোরো না, একটা না একটা রাস্তা বের হয়ে যাবেই। আপাতত যে কাজে এসেছি সেটা করি।"

আবীরের কথায় সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল দীপ। তারপর আবীরকে অনুসরণ করে এগোতে লাগল। আবীর চারদিকে তাকাচ্ছে বার বার, নতুন কিছুই তার চোখে পড়ছে না। কিছু থাকলে এখানেই থাকবে বলে আবীরের ধারণা ছিল। কিন্তু ল্যাবের পরিচিত সরঞ্জামের বাইরে আর কিছুই দেখতে না পেয়ে আবীর খানিকটা হতাশই হল।

হঠাৎ আবীরের দৃষ্টি চলে গেল ল্যাবরেটরীর দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ দিকে একটা কালো কাপড়ের বড় পর্দা টাঙানো, পর্দার অন্য পাশে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। দক্ষিণ দিকের এই অংশটুকু পর্দা দিয়ে ঢাকা ছয়-সাত মাস আগে থেকেই। ছাত্রছাত্রীরা যখন ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য আসত, তখন রাজ্জাক স্যার তাদেরকে বার বার এই পর্দার

কাছাকাছি যেতে নিষেধ করতেন। কেন নিষেধ করতেন সেটা ছিল একটা রহস্য। আবীরেরও কম কৌতুহল হয় নি পর্দার ওপাশে কী আছে তা জানার জন্য। আজ সে তার কৌতুহল মেটানোর একটা সুযোগ পেয়েছে।

আবীর এগিয়ে গেল পর্দার কাছে। পর্দার কিনারা ধরে টেনে একপাশে কিছুটা সরালো। পর্দা সরাতেই দেখা গেল সেখানে একই রকম দেখতে অনেকগুলো বাক্স পাশাপাশি রাখা আছে। একটা বাক্সের কাছে গিয়ে বাক্সের ওপরের ঢাকনা সরিয়ে ভেতরে উকি দিল আবীর। ভেতরে আয়তাকার বাক্সের মত একটা যন্ত্র। যন্ত্রটির গায়ে বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো বোতাম দেখা যাচ্ছে। যন্ত্রের মাঝখানে একটা টিউব বসানো, টিউবের ভেতরে বেগুনী রঙের তরল পদার্থ। টিউবটির দুই দিক থেকে অনেকগুলো তার টিউবের ভেতরে ঢোকানো রয়েছে। আবীর তার শার্টের বোতামের সাথে লাগানো ক্যামেরাটা স্পর্শ করে দেখে নিলো ক্যামেরাটা জায়গামত আছে কিনা। এই যন্ত্রটার মাথামুণ্ডু কিছুই সে বুঝতে পারছে না, ক্যামেরায় এটার ছবি ঠিকমত উঠে থাকলে সাইফ স্যারকে নিয়ে দেখাতে হবে। তিনি নিশ্চয়ই জানবেন এটা কী জিনিস। "কিছুই তো বুঝতে পারছি না," পাশ থেকে বলল দীপ, "কী এটা?"

আবীর বলল, "আমিও বুঝতে পারছি না। তবে আমার যা মনে হচ্ছে, এটা সেই ডিভাইস যেটার সাহায্যে বাতাসে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়া হয়। আর ফাইজান খানের হাতে যেই রিমোট কন্ট্রোলটা ছিল, সেটার সাহায্যেই এই ডিভাইসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় সম্ভবত।" একটু থেমে যন্ত্রটাকে এক নজর দেখল আবীর। তারপর বলল, "যদিও পুরোটাই আমার অনুমান। দেখা যাক সাইফ স্যার কী বলেন।"

আবীর মনোযোগ দিয়ে ডিভাইসটাকে পর্যবেক্ষণ করছিলো, এমন সময় শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। কেউ একজন আসছে! দীপ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবীর দীপের হাত ধরে হ্যাচকা টান দিয়ে একটা বাক্সের পেছনে নিয়ে গেল। বাক্সটার পেছনে বসে পড়ল তারা দু'জন। আবীর নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে আছে দরজার

দিকে। পায়ের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পায়ের মালিককে দরজায় দেখা যাবে। কে হতে পারে? শীর্ষ সন্ত্রাসী সোলায়মান মোল্লা? নাকি রসায়নের অধ্যাপক রাজ্জাক স্যার? নাকি পাকিস্তানী এজেন্ট ফাইজান খান?

সেরকম কাউকেই অবশ্য দেখা গেল না। ধীর পায়ে দরজার সামনে দিয়ে হেটে চলে গেল একজন ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তি। হাফ ছেড়ে বাঁচলো আবীর আর দীপ। বাক্সের পেছন থেকে উঠে দাড়ালো তারা দু'জন। "এবার বেরোতে হবে এখান থেকে।" বলে দরজার দিকে পা বাড়ালো আবীর। ঠিক তখনই প্রচণ্ড শব্দে হাঁচি দিয়ে বসলো দীপ! হাঁচির শব্দে ভয়ানক চমকে উঠলো আবীর। পেছন ফিরে দীপের দিকে তাকালো সে। দীপ দু'হাতে তার মুখ চেপে ধরে রেখেছে। স্বভাববশত দু'হাত দিয়ে হাঁচি আটকানোর চেষ্টা করেছিলো দীপ। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয় নি, বরং এই সুনসান নীরবতার মধ্যে হাঁচির শব্দ স্বাভাবিকের চাইতেও দ্বিগুণ জোরে শোনা গেছে। আর সেটা যার শোনার সে ঠিকই শুনে নিয়েছে। আর তার পায়ের শব্দ বলে দিচ্ছে, সে তার দিক পরিবর্তন করে আবার এদিকেই ফিরে আসছে!

ল্যাবের দরজায় এসে দাড়ালো ভাইরাস আক্রান্ত সেই লোকটি। অন্ধকারে তার চেহারা ঠিকমত দেখা না গেলেও তার জ্বলজ্বলে বেগুনী রঙের চোখ দু'টো দেখা যাচ্ছে। লোকটি দু'হাত তুলে এগিয়ে আসতে লাগলো আবীর আর দীপের দিকে। ভয়ঙ্কর দর্শন লোকটিকে এগিয়ে আসতে দেখে আতঙ্কে হাত পা থরথর করে কাপতে লাগলো আবীরের। সে নড়তেও পারছে না, তার পা যেন বরফের মত জমে গেছে! দীপ এখনো দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে। তার পা দু'টো ঠকঠক করে কাপছে। আবীর শুনতে পেল, দীপ বিড়বিড় করে কিছু একটা আউড়াচ্ছে। কোন মন্ত্র টন্ত্র হবে হয়ত।

লোকটি তাদের সামনে এসে দাড়াতেই দীপ একটা কাণ্ড করে বসলো। সে তার ডান হাত দিয়ে কষে একটা চড় মারল লোকটির মুখে! আর ওমনি লোকটি পাক খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আবীর অবাক হয়ে তাকালো দীপের দিকে। সে হাপাচ্ছে। দ্রুত

পকেট থেকে ইনহেলার বের করে মুখের মধ্যে দু'বার স্প্রে করল সে। এরকম একটা হ্যাংলা পাতলা ছেলের গায়ে যে এত শক্তি থাকতে পারে, এমনটা ভাবে নি আবীর। তার হাতে একটা চড় খেয়েই একটা মানুষ ধরাশায়ী হয়ে পড়ল!

"চলো! দ্রুত পালাতে হবে এখান থেকে!" তাড়া দিয়ে বলল আবীর। তারপর সে দৌড়ে বের হল ল্যাবের দরজা দিয়ে। তার পেছেন পেছন বের হল দীপও। ডানদিকে ঘুরে তারা দৌড়াতে শুরু করল সিড়ির দিকে। সিড়ি দিয়ে নেমে বাঁ দিকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরেই কলেজের গেট। গেটটা এর মধ্যে বন্ধ করে না দিলেই হয়, মনে মনে ভাবলো আবীর। কিন্তু গেট পর্যন্ত যাওয়া তো দূরে থাক, সিড়ির কাছাকাছি এসেই তাদেরকে থমকে দাড়াতে হল। সিড়ির নিচে থেকে দু'জন গার্ডের কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এলো।

-"তুমনে ঠিক সুনা?"

-"হা। ছিঁক কি আওয়াজ উপরসে হি আয়া থা।"

-"হো সাকতা হ্যায় হামারে হি কোয়ি আদমি উপর হো।"

-"ফির ভি চলকে দেখনা চাহিয়ে।"

-"তো ফির চলো।"

সিড়িতে গার্ড দু'জনের বুটের শব্দ শোনা যেতে লাগলো। তারা উপরে উঠে আসছে। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল আবীর আর দীপ। দীপের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ।

"এ-এখন কী হবে?" ভয়ে তোতলাতে লাগলো দীপ।

"যেদিক থেকে এসেছি, সেদিকেই ফিরে যেতে হবে।" গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল আবীর।

"কিন্তু....." কথা শেষ করতে পারল না দীপ, তার আগেই আবীর তার হাত ধরে হ্যাচকা টান মারল। তারপর যেদিক থেকে তারা এসেছিলো আবার সেদিকেই

দৌড়াতে লাগলো। দীপ বুঝতে পারছে না তারা ওদিকে কোথায় যাচ্ছে। দৌড়াতে দৌড়াতে সে জিজ্ঞেস করল, "আমরা ওদিকে কেন যাচ্ছি?"
"ওদিকে ছাদে ওঠার সিড়ি।" দৌড়াতে দৌড়াতেই জবাব দিলো আবীর, "এখান থেকে ঐ একটা রাস্তাই এখন খোলা আছে!"
আবীরের কথা শুনে আৎকে উঠলো দীপ। আবীর কি তাহলে ছাদ থেকে লাফ দেয়ার মতলব করেছে? দীপ ভয়ে ভয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল আবীরের ধমক খেয়ে।
"চুপ! আর একটা কথাও না!"

ছাদে পানির ট্যাংকের পাশ দিয়ে একটা পানির পাইপ সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে। এর আগে অনেকবার ক্লাস ফাকি দিয়ে পালাবার রাস্তা হিসেবে পাইপটাকে ব্যবহার করেছে আবীর। কলেজ আওয়ারে যখন গেট বন্ধ থাকত, তখন সে প্রায়ই ছাদে উঠে পানির পাইপ বেয়ে তরতর করে নিচে নেমে যেত। আজও সেই রাস্তাই ব্যবহার করবে বলে ঠিক করেছে সে। যদিও দীপকে জিজ্ঞেস করা হয় নি, তার পাইপ বেয়ে ওঠা নামা করার অভ্যাস আছে কিনা।

ছাদের সিড়ি পর্যন্তও যাওয়া হল না, কেমিস্ট্রি ল্যাবের সামনে এসে আবারও থমকে দাড়াতে হল। কারণ তারা যেদিকে যাচ্ছিলো সেদিক থেকে চারজন সশস্ত্র গার্ড এগিয়ে আসছে তাদের লক্ষ্য করে। আবীর পেছন ফিরে দেখলো সেই দুইজনও তাদের অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছে।
"ও রাহে! পাকড়ো উন দোনো কো!!" আবীর আর দীপকে দেখিয়ে বলল একজন।

তাদের দু'জনের দিকে অস্ত্র তাক করে দু'দিক থেকে তেড়ে আসতে লাগলো গার্ডরা। আবীর আর কোন উপায় দেখতে না পেয়ে দীপকে টেনে নিয়ে গেল কেমিস্ট্রি ল্যাবের ভেতরে, তারপর ল্যাবের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো। দীপ প্রচণ্ড হাপাচ্ছে,

তার বুক ধড়ফড় করছে। পকেট হাতড়ে তার ইনহেলারটা বের করল সে। ইনহেলার মুখে ঢুকিয়ে দু’বার স্প্রে করায় তার হাঁপানো কমলো।
“এ-এটা কী করলে?!” ভয়ার্ত গলায় দীপ বলল, “আমরা তো আ-আরও ফেসে গেলাম!! ওরা এখন দ-দরজা ভেঙে ঢ্বঢুকে.....”
দীপ বলে সাড়তে পারল না, তার আগেই দরজায় আঘাতের প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। গার্ডরা দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে! একটার পর একটা আঘাত করতে লাগলো তারা দরজার ওপর।
“এভাবে চলতে থাকলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই দরজাটা ভেঙে যাবে!” মরিয়া হয়ে বলল আবীর। সে আশেপাশে তাকাতে লাগলো ভারী একটা কিছুর খোঁজে, যেটা দরজার ওপর চাপা দিয়ে রাখা যায়। বড় টেবিলটার ওপর চোখ পড়তেই সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলল, “ঐ টেবিলটার এক কোণা ধরো, তারপর ওটাকে টেনে দরজার দিকে সরাও।”

দীপের প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে আবীরের ওপর, তবুও আবীরের কথামত টেবিলের এক কোণা ধরে টানতে শুরু করল সে। আবীরও টেবিলের আরেক কোণা ধরে টানতে লাগলো। টেবিলটা যখন দরজার কাছাকাছি সরে এসেছে, তখন আবীর দীপকে ইশারা করল টেবিলের বিপরীত পাশে চলে যেতে। আবীর নিজেও গেল। তারপর টেবিলটাকে দরজার দিকে আরও খানিকটা ঠেলে একদম দরজার ওপর লাগিয়ে দিল।

দীপের দিকে তাকালো আবীর। সে চোখে এক রাশ আতঙ্ক নিয়ে এক দিকে তাকিয়ে আছে। দীপের দৃষ্টি অনুসরণ করে আবীর সেদিকে তাকাতেই তার মেরুদণ্ড বেয়ে আতঙ্কের শীতল স্রোত বয়ে গেল। একটা লোক মেঝেতে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। এই লোকটাকেই দীপ কিছুক্ষণ আগে চড় মেরেছিলো। লোকটি তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলো, এখন তার জ্ঞান ফিরেছে।

“তোমরা কারা?” তাদের দু’জনকে অবাক করে দিয়ে লোকটি জিজ্ঞেস করল, “আর আমি এখানে কেন?”
আবীর লক্ষ্য করল, লোকটির চোখ এখন আর বেগুনী নেই, বরং বাদামী রঙের সুন্দর এক জোড়া চোখ। আবীর জিজ্ঞেস করল, “আপনি সুস্থ?”
“মাথাটা কেমন যেন বন বন করছে।” উঠে দাড়াতে দাড়াতে লোকটি বলল, “আমার কী হয়েছিলো?”

আবীর বা দীপ কিছু বলার আগেই আগের চাইতে প্রায় তিনগুণ বেশি শব্দে আঘাত হল দরজার ওপর। এবার আরও ভারী কিছু দিয়ে দরজার ওপর আঘাত করছে ওরা!
“সব কথা পরে হবে, আগে এখান থেকে বাইরে যাওয়ার একটা রাস্তা তৈরি করতে হবে।” বলে চারপাশে চোখ বুলাতে লাগলো আবীর। এদিকে দরজার ওপর একের পর এক আঘাত চলছে তো চলছেই। দরজাটা কাঠের তৈরি হলে এতক্ষণে ওরা দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ত। আবীর পশ্চিম দিকের একটা জানালা দেখিয়ে বলল, “ঐ জানালার গ্রিল কাটার মত কিছু পাওয়া যায় কিনা দ্যাখো।” বলে আবীর নিজেও খুজতে লেগে গেল।

দীপ আর সেই লোকটাও খোঁজা শুরু করল। খুজতে খুজতে দীপ বলল, “তুমি যদি জানালা দিয়ে লাফ দেয়ার পরিকল্পনা করে থাকো, তাহলে আমি বলব এর চেয়ে ওদের হাতে ধরা পড়াই ভালো। কারণ হাত পা ভেঙে সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকার চাইতে গুলি খেয়ে একবারে মরাই ভালো।”
“চুপ থাকো।” ধমক দিয়ে বলল আবীর, “নয়ত তোমাকে ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি একাই পালাব।”
“পেয়েছি!!” লোকটির চিৎকার শুনে দু’জনেই একসঙ্গে তাকালো তার দিকে। লোকটির হাতে একটা হ্যাক ’স ব্লেড, সে সেটা উচু করে করে ধরে রেখেছে। উত্তেজণায় তার চোখ দু’টো চকচক করছে। সে হ্যাক ’স ব্লেডটা আবীরের দিকে

বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “এটা পেয়েছি ওখানে। বেশ ধারালো! দ্যাখো এটা দিয়ে কাটতে পারো কিনা।”

আবীর এগিয়ে গিয়ে সেটা হাতে নিল। আসলেই অনেক ধারালো, এই অন্ধকারেও চকচক করছে! সম্ভবত কয়েকদিন আগেই কেনা হয়েছে। আবীর আর দেরি না করে দ্রুত চলে গেল জানালার কাছে। তারপর মাঝখানের গ্রিলের নিচে হ্যাক ’স ব্লেডটা ধরে দ্রুত সামনে-পেছনে টানতে লাগলো। একে তো দরজায় আঘাতের শব্দ, তার ওপর এই হ্যাক ’স ব্লেডের ক্যাচ্ ক্যাচ্ শব্দ; দুইয়ে মিলে একদম কানে তালা লোগে যাওয়ার অবস্থা হল তিনজনেরই।
“ধ্রাম!! ধ্রামমম!!!”

দরজায় আঘাত আরও বেড়ে গেল। লোকগুলো যেন অস্থির হয়ে উঠেছে! যেকোন সময় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে হিংস্র হায়েনার মত তাদের তিনজনের ওপর ঝাপিয়ে পড়বে। আবীর তাই আরও দ্রুত হাত চালাতে লাগলো।

“আমি এখনো বুঝতে পারছি না, আমি এখানে কী করে এলাম?” লোকটি, যে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ভাইরাস আক্রান্ত ছিল, সে জিজ্ঞেস করল, “আর আমরা এভাবে জানালা ভেঙে কেন বের হচ্ছি? দরজা দিয়ে কেন বের হচ্ছি না?”
আবীর লোকটির প্রশ্নের জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন মনে করল না। তাই দীপ বলল, “কারণ দরজার বাইরে আমাদের জন্য এক বিশাল অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছে।”
লোকটি বোধহয় আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু সে থেমে গেল বাইরে অন্য একজনের কণ্ঠ শুনতে পেয়ে। সে এবং দীপ দু’জনেই কান খাড়া করল। আবীরও কান খাড়া করল, কিন্তু কাজ থামালো না।
-“কী হচ্ছে এখানে?”
-“স্যার, দো বাহার কি আদমি আন্দার যাকে দরওয়াজা লক কর দিয়া হ্যায়!”

-"বাইরের লোক?! বাইরের লোক কোত্থেকে এল?"
-"ফেস বদলকে আয়া হ্যায় স্যার।"
-"তাহলে তোমরা করছ টা কী?! তাড়াতাড়ি দরজা ভেঙে ওদেরকে বের করে আনো! আর কেউ একজন গিয়ে ফাইজান সাহেবকে খবর দাও!

কণ্ঠটা চিনতে পারল আবীর। এটা রাজ্জাক স্যারের কণ্ঠ। পাকিগুলো তাকে স্যার বলে সম্বোধন করছে, আর তিনিও বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে কথা বলছেন ওদের সাথে। তারমানে ফাইজান খান তাকে ভালো অবস্থানেই রেখেছে। আবীর কিছুতেই মানতে পারছে না, তার পছন্দের একজন শিক্ষক ক্ষমতার লোভে বিক্রি হয়ে গেছেন!

গ্রিলটা নিচ দিয়ে কাটা হয়ে গেছে। আবীর গ্রিলটা হাতের মুঠোয় ধরে মোচড়াতে লাগলো। গ্রিলটা খুব বেশি মোটা না, তাই অল্প কয়েকবার ঘোরাতেই সেটা ভেঙে তার হাতে চলে এলো। আবীর ফাক দিয়ে প্রথমে তার ডান পা গলিয়ে দিলো, তারপর মাথা নিচু করে শরীরের বাকি অংশটাও বাইরে বের করে নিল। জানালার বাইরের কার্নিশের ওপর দাড়িয়ে বাকি দু'জনকেও ডাকলো সে। বাকি দু'জন ভয়ে ভয়ে একই কায়দায় নামলো কার্নিশের ওপর। তারপর সামনে তাকাতেই ভয় খানিকটা কেটে গেল। এবার তারা বুঝতে পারছে, আবীরের মতলবটা কী। কার্নিশের পাশেই একটা বৈদ্যুতিক খুটি। আবীর কী তাহলে ঐ খুটিটা বেয়ে নামার কথা ভাবছে?
"ওটা বেয়ে নামতে পারবে?" খুটিটা দেখিয়ে দীপকে জিজ্ঞেস করল আবীর।
"হ্যা। পারব।" কাঁধ নেড়ে বলল দীপ।
"তাহলে তাড়াতাড়ি নামো, আমি পেছনে আসছি।" বলল আবীর।

খুটি বেয়ে টিকটিকির মত তরতর করে নামতে শুরু করল দীপ। বোঝা যাচ্ছে ছেলেটা এই কাজে অভ্যস্ত। এরপর যখন আবীর নামতে যাবে তখন সেই লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আমি কীভাবে নামব? আমার তো এসবের অভ্যাস নেই!"

"আপনি আমাকে দেখুন।" আবীর বলল লোকটিকে, "আমি যেভাবে নামছি ঠিক সেভাবে নেমে যাবেন, তেমন কঠিন কিছু না।"
লোকটি ইতস্তত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। আবীর প্রথমে দু'হাতে পিলারটাকে জড়িয়ে ধরল, তারপর দু'পা দিয়ে পেচিয়ে ধরল। এরপর বিশেষ কায়দায় দুই হাত দিয়ে ওপরের দিকে ঠেলে পিলার বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল। লোকটির দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আপনিও নেমে আসুন এভাবে।"
"ধড়ামমমম!!!!!!!!!!!!"

দরজা ভেঙে যাওয়ার প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। ওরা দরজা ভেঙে ফেলেছে! আবীর দ্রুতগতিতে নিচে নামতে শুরু করল। ক্ষণিকের জন্য সে লোকটার কথা ভুলেই গেল।
"ধাঁই!! ধাঁআঁআঁইইই!!!"
গুলির আওয়াজ! ওপর থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। ওরা গুলি করছে! আবীর কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই লোকটা একটা আর্তনাদ করে উঠলো, তারপর আবীরের পাশ দিয়ে ধপাশ করে নিচে পড়ল। আবীর নিচের দিকে তাকালো। দেখলো দীপ হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে, আর দীপের পায়ের কাছে পড়ে আছে লোকটির রক্তাক্ত দেহ!

নিচে নেমেই আবীর দৌড়ে গেল লোকটির কাছে। হাটু গেড়ে বসে পরীক্ষা করে দেখলো লোকটি বেঁচে আছে কিনা। না, বেঁচে নেই। বেঁচে না থাকারই কথা। এতগুলো গুলি গায়ে এসে বিঁধলে মানুষ কেন, কোন প্রাণীরই বেঁচে থাকার কথা না।
"জানালায় দাড়িয়ে দেখছ কী? জলদি নিচে গিয়ে ধরো ওদের!" রাজ্জাক স্যারের হুংকার ভেসে এল ওপর থেকে। রাজ্জাক স্যারের কণ্ঠে এরকম হুংকার আবীর আগে কখনো শোনে নি; আর কখনো শুনবে বলেও ভাবে নি। তিনি আবারও বললেন, "জলদি! ওরা যেন পালাতে না পারে!"
"আবীর!" তাড়া দিয়ে বলল দীপ, "ওরা নিচে এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই। চলো পালাই!"

"চলো।" উঠে দাড়িয়ে ধরা গলায় বলল আবীর। লোকটির জন্য ভেতরটা হাহাকার করে উঠলো আবীরের। লোকটির সঙ্গে পরিচয় মাত্র অল্প কয়েক মিনিটের, তার নামটা পর্যন্ত জানা হয় নি। অথচ এই অল্প কতক্ষণের মধ্যেই এই নাম না জানা লোকটি তাদের মনে এমন একটা জায়গা করে নিয়েছে যে জায়গা কেউ কয়েক বছরেও করতে পারে না!

চোখের পাতা ভিজে উঠলো আবীরের। আবীর তার বাবার কাছে শুনেছিলো, যুদ্ধক্ষেত্রে কখন কে আপন হয়ে ওঠে আর কখন কে পর হয়ে যায়, তা কেউ বলতে পারে না। আজ সে তার প্রমাণ পেল। এটাও তো একটা যুদ্ধক্ষেত্র!

১১.

“পাকিগুলো কেমন মাথা মোটা দেখলে?” হাসতে হাসতে বলল দীপ, “আমি তো ভেবেছিলাম ওরা পুরো কলেজ বিল্ডিং ঘিরে ফেলেছে! পিলার বেয়ে আমরা নিচে নামার সাথে সাথেই বুঝি আমাদেরকে ধরে ফেলবে। কিন্তু না! ওরা ল্যাবের দরজা ভাঙতেই ব্যস্ত। সবক'টা এসে ভিড় জমিয়েছে ল্যাবের দরজার সামনেই!”

দীপের কথা শুনে আবীরও হাসল। সে বলল, “আমিও অবাক ওদের বোকামী দেখে। আবার মনে হচ্ছে ওরা কি নিজেরা বোকা, নাকি আমাদেরকেই ওরা বোকা ভেবেছে? ওরা কি ভেবেছে যে আমরা দরজা বন্ধ করে ভেতরেই বসে থাকব, অন্য রাস্তা দিয়ে আর বের হওয়ার চেষ্টা করব না?”

দীপ আরও শব্দ করে হাসল। জোনাকি এখনো মুখ ভার করে বসে আছে। আবীরদের সাথে যেতে না পারায় তার মন এখনো খারাপ। আর এদিকে ড. সাইফ রাজু গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছেন তার ল্যাপটপের স্ক্রীণের দিকে। আবীরের শার্টের বোতামে লাগানো ক্যামেরায় রেকর্ড করা ভিডিও পজ করে সেই ডিভাইসটার ছবি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছেন তিনি।

আবীরের ধারণাই সঠিক। কেমিস্ট্রি ল্যাবে তারা যে ডিভাইসটা দেখে এসেছে, সেটা ব্যবহার করা হয় বিস্ফোরণের মাধ্যমে বাতাসে কোন কিছু ছড়িয়ে দেয়ার কাজে। এই ডিভাইসের সাহায্যেই বাতাসে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আবার এটার সাহায্যেই একই ভাবে বাতাসে ভাইরাসের এ্যান্টিডোটও ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব।

"এটার মেকানিজম খুবই সোজা।" দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বললেন সাইফ রাজু, "ভাইরাসের এ্যান্টিডোট আর এই ডিভাইসটা যদি হাতে পাওয়া যেত তাহলে খুব সহজেই মানুষগুলোকে ভাইরাসের প্রভাবমুক্ত করা যেত।"

"এ্যান্টিডোটটা হলেই হয়।" জোনাকি বলল, "কারণ ফাইজান খান তো বলল তার রিমোট কন্ট্রোলের ইশারায় চারটি জায়গায় বিস্ফোরণ হবে। তারমানে ডিভাইসগুলো এখন ঐ জায়গাগুলোতেই সেট করা আছে।"

"জোনাকি ঠিকই বলেছে," সাইফ স্যার বললেন, "এ্যন্টিডোট যদি হাতে পাওয়া যায়, আর এটা যদি জানা যায় যে ডিভাইসগুলো কোথায় কোথায় সেট করা হয়েছে, তাহলে আমরা খুব সহজেই ডিভাইসের ভেতরের টিউবটা বদলে দিয়ে ভাইরাসের জায়গায় ভাইরাসের এ্যান্টিডোটটা রেখে দিতে পারি। তখন বিস্ফোরণ হলে বাতাসে ভাইরাসের পরিবর্তে ভাইরাসের এ্যন্টিডোট ছড়িয়ে পড়বে।"

"কিন্তু এতটা কি সহজ হবে?" গম্ভীর মুখে বলল আবীর, "ডিভাইসগুলোর আশেপাশে অবশ্যই পাহাড়ার ব্যবস্থা থাকবে, কিংবা সিসি ক্যামেরা থাকবে। আর সেসব এড়িয়ে যদি আমরা ডিভাইসগুলোর কাছে পৌছেও যাই, তাহলেও একটা সমস্যা তো থেকেই যাচ্ছে। সেটা হল রিমোট কন্ট্রোল, যেটা কিনা ফাইজান খানের হাতে।"

"আর সেই রিমোট কন্ট্রোলে তো দেখলাম কোন রকম বাটন নেই, শুধুই একটা ফিঙ্গার প্যাড।" একটা দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে দীপ বলল, "তারমানে ওটা শুধুমাত্র ফাইজান খানই অপারেট করতে পারবে, তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে।"

সবার মুখেই একটা হতাশার ছায়া নেমে এল। নীরবে কাটলো কয়েক মুহূর্ত। হঠাৎ সাইফ স্যার বলে উঠলেন, "দীপ!"

সাইফ স্যারের গলার স্বরে এমন কিছু একটা ছিল, যার কারণে তিনজনই চমকে উঠলো। তারা অবাক হয়ে তাকালো সাইফ স্যারের দিকে। স্যারের চোখ দু'টো চকচক করছে উত্তেজণায়।

"কেমিস্ট্রি ল্যাবে গিয়ে তুমি কীসে কীসে হাত লাগিয়েছিলে সেটা মনে আছে?" উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন ড. সাইফ রাজু।

"না তো!" অবাক হয়ে বলল দীপ, "আমি তো কোন কিছুতেই হাত লাগাই নি। সবকিছু নাড়াচাড়া করছিলো আবীর।"
"তুমি শিওর তুমি হাত দিয়ে কিছু ধরো নি?" জিজ্ঞেস করলেন সাইফ স্যার, "তাহলে তোমার থাপ্পর খেয়ে ঐ লোকটা সুস্থ হয়ে গেল কীভাবে?"
এই প্রশ্নটা এতক্ষণ কারো মাথায়ই আসে নি। জোনাকিও হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো, সে সাইফ স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার! আপনার মনে আছে আজ দুপুরে যখন একটা লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিলো, তখন আমি তার মুখে থুতু মেরেছিলাম? তার মুখে থুতু দিয়ে যখন আমরা পালিয়ে আসছিলাম, তখন সে একদম সুস্থ মানুষের মত চিৎকার করছিলো!"

থুতু মারার কথা শুনে আবীর আর দীপ দু'জনেই অবাক হয়ে তাকালো জোনাকির দিকে। তাদের দু'জনের কাছে কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে জোনাকি বলল, "আসলে রেগে গিয়ে কিংবা ভয় পেয়ে থুতু মারাটা আমার অভ্যাস। সেরকম পরিস্থিতিতে পড়লে অনেক সময় আমার মুখ থেকে অটোমেটিক্যালি থুতু বেরিয়ে আসে! এর আগে একবার স্কুল থেকে ফেরার পথে একটা ছেলে আমাকে টীজ করেছিলো, আমি তার মুখেও থুতু দিয়েছিলাম।"

জোনাকির থুতুর কথা শুনে দীপের মনে পড়ল তার হাঁচি দেয়ার কথা। সে সাইফ স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, "মনে পড়েছে স্যার! থাপ্পড়টা মারার আগে আমি হাঁচি দিয়েছিলাম, আর তখন আমার দুই হাত আমার মুখের সামনে ছিল।"
"ইউরেকা! ইউরেকা!!" উত্তেজণায় রীতিমত লাফিয়ে উঠলেন সাইফ স্যার। তার চোখ মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। তিনি বললেন, "পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি এ্যান্টিডোট!!"
"এ্যান্টিডোট?!" তিনজনেই অবাক।
"হ্যা।" সাইফ স্যার বললেন, "আমাদের সবার মুখের লালাই এই ভাইরাসের এ্যান্টিডোট!"

“আমাদের মুখের লালা?” বিস্ময় ঝরে পড়ল আবীরের কণ্ঠে। বাকি দু’জনের দিকে তাকালো সে, তাদেরও চোখ ছানাবড়া। তারা ভাবতেই পারছে না যে একটা ভাইরাসের এ্যান্টিডোট কী করে মানুষের মুখের লালা হয়!
“হ্যা, আমাদের মুখের লালা!” সাইফ স্যার আবীরের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, “আমাদের যাদের যাদের রক্তে অক্সিজেনের তারতম্য আছে, তাদের মুখের থুতুই এই ভাইরাসের এ্যান্টিডোট হিসেবে কাজ করবে।”
“কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না।” চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল দীপ, “আমাদের রক্তে অক্সিজেনের তারতম্য হওয়ার কারণ কী?” একটু থেমে বাকি দু’জনের দিকে একবার তাকালো দীপ। তারপর সাইফ স্যারের দিকে তাকিয়ে কিছুটা লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে সে বলল, “আসলে আমি কমার্সের ছাত্র। বিজ্ঞানের অতশত বুঝি না।”

সাইফ স্যার বলতে শুরু করলেন, “রক্তে যখন বাইরে থেকে কোন কৃত্রিম উপাদান প্রবেশ করে তখন রক্তে অক্সিজেনের তারতম্য সৃষ্টি হয়। যেমন তুমি শ্বাসকষ্টের জন্য ইনহেলার ব্যবহার করো, আবার আমি ডায়াবেটিসের জন্য ইনসুলিন নিই। তাই আমাদের রক্তে অক্সিজেনের তারতম্য আছে।”
“আর আমি টেস্টোস্টেরণ হরমোনের ঘাটতির জন্য টেস্টানোন নামে একটা ইঞ্জেকশন নিই।” যোগ করল আবীর, “তাই আমার রক্তে অক্সিজেনের তারতম্য থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক।”
“তাহলে তো বলতে হয় আমার চাচা আমাকে বিক্রি করার মতলব করে ভালই করেছিলেন।” মৃদু স্বরে বলল জোনাকি। কথাটা বলতে গিয়ে তার গলা কেপে উঠলো। জোনাকির কথা শুনে সবার দৃষ্টি ঘুরে গেল জোনাকির দিকে। কৌতুহলী দৃষ্টিতে সবাই তাকালো তার দিকে।
“মানে?” ভ্রু কুচকে জিজ্ঞেস করলেন সাইফ স্যার।

জোনাকি একটা দীর্ঘঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলতে শুরু করল, “আমার বাবা মা নেই, থাকি চাচা-চাচীর কাছে। চাচা কী করেন তা জিজ্ঞেস করলে তিনি কেবল বলতেন

অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। তার এই অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসাটা যে আসলে কী, তা বুঝতে পারলাম এ বছর এস.এস.সি পরীক্ষা শেষ হবার পর, যখন চাচা আমাকে সৌদি আরবের এক শেখের কাছে নিয়ে গেলেন বিক্রি করার জন্য।”

একটু থামলো জোনাকি। সবাই রুদ্ধশ্বাসে শুনছে জোনাকির কথা। আবার বলতে লাগল সে, “আমার শারীরিক গড়ন তার তেমন পছন্দ হল না। এদিকে চাচা আবার তার কাছ থেকে এডভান্স টাকা নিয়ে রেখেছিলেন। তাই তিনি কয়েকটা দিন সময় চাইলেন তার কাছে, আমাকে তার মন মত করে তোলার জন্য। সেইদিনের পর থেকে চাচা আমাকে স্টেরয়েড দেয়া শুরু করলেন।”

আবীরের চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে। সবাইকে আড়াল করে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছলো সে। চোখের কোণা দিয়ে সে একবার দীপ আর একবার সাইফ স্যারের দিকে তাকালো। দীপের চোখেও জল এসে গেছে। আর সাইফ স্যার মুখ শক্ত করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন।

জোনাকি মাথা নীচু করে নীরবে কাঁদছে। আবীর আর দীপ একজন আরেকজনের দিকে তাকালো। তারা কেউই বুঝতে পারছে না এই মুহুর্তে তাদের ঠিক কী করা উচিত। একবার ভাবলো জোনাকিকে সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু কী বলে সান্ত্বনা দেবে তারা?

সাইফ স্যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। তারপর জোনাকির কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, “আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মা, দেশের অবস্থা আবার আগের মত হয়ে যাওয়ার পর আমি তোমার চাচার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। তাকে জেলের ভাত না খাইয়ে আমি ছাড়ছি না!”

****

শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলো আবীর। দীপের দিকে তাকিয়ে দেখলো সে ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠে দাড়িয়ে খুব সাবধানে দীপকে পাশ কাটিয়ে পা টিপে টিপে দরজার কাছে গেল আবীর। একবার পেছন ফিরে দেখলো দীপের দিকে। না, ঘুম ভাঙে নি তার। আজ সারাদিন বেচারার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে, তাই তার ঘুম ভাঙাতে চাচ্ছে না সে। ঘর থেকে বের হয়ে কোন রকম শব্দ না করে সে হাটতে লাগলো সাইফ স্যারের ঘরের দিকে। সাইফ স্যারের কাছে কিছু বিষয় জানার আছে আবীরের।

সাইফ স্যারের ঘরের দরজা ভেড়ানো। আবীর দরজার সামনে দাড়িয়ে দরজার ফাক দিয়ে ভেতরে উকি দিলো। স্যার এখনো ঘুমান নি। দু'হাত পেছনে নিয়ে জানালার সামনে দাড়িয়ে আছেন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কিছু ভাবছেন সম্ভবত।
"আসতে পারি স্যার?"

আবীরের ডাকে ধ্যান ভাঙলো সাইফ স্যারের। পেছন ফিরলেন তিনি। দরজায় আবীরকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "সেকি! তুমি এখনো ঘুমাও নি?"
"ঘুম আসছিলো না স্যার।" ঘরের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে আবীর বলল, "আজ সন্ধ্যার পর থেকেই আমার মাথায় কিছু প্রশ্ন ঘুর ঘুর করছে। আর সেগুলো নিয়ে যত ভাবছি ততই কেবল সবকিছু জট পাকিয়ে যাচ্ছে!"

সাইফ স্যার তার টেবিলের কাছে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন। আবীরকেও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে ইশারা করলেন তিনি। আবীর একটা চেয়ার টেনে বসলো। তারপর সাইফ স্যার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বলো। কী প্রশ্ন?"
"স্যার," আবীর বলতে শুরু করল, "প্রজেক্ট পাই এত বড় একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, অথচ এই ষড়যন্ত্রে এরকম একটা ভুল কী করে থেকে গেল?"

সাইফ স্যার একটু নড়ে চড়ে বসলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। সাইফ স্যারের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে আবীর বলল, “আমার কী মনে হয় জানেন স্যার? ভাইরাসের মধ্যে এই ত্রুটি আসলে ভুলক্রমে থেকে যায় নি, বরং এটা ইচ্ছাকৃত!”

“তারমানে তুমি বলতে চাইছ,” বিস্মিত কণ্ঠে বললেন ড. সাইফ রাজু, “ডক্টর নীলকণ্ঠ ইচ্ছা করেই ভাইরাসে এরকম একটা ত্রুটি রেখে দিয়েছেন?” বিস্ময়ে তার চোখ কপালে উঠে গেল। এভাবে তিনি ভেবে দেখেন নি। ড. নীলকণ্ঠ দেবনাথকে অপরাধী ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তার। আবার তার পক্ষে সাফাই দিয়ে বলার মতও কিছু খুজে পাচ্ছিলেন না তিনি।

“হতেই পারে স্যার!” আবীর বলল, “হয়ত শেষটায় যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তার বানানো ভাইরাস দিয়ে তার নিজের দেশেও আক্রমণ করা হবে, তখন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। পরে তিনি তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যেই ভাইরাসের ফর্মূলায় কিছু ওলট পালট করে দিয়ে প্রজেক্ট পাইয়ের ওপর জল ঢেলে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সময়ের অভাবে হয়ত তিনি বেশি কিছু করে যেতে পারেন নি।”

সাইফ স্যার কয়েক মুহুর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইলেন আবীরের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, “হয়ত এই কারণেই তিনি তার অন্য কোন সহকর্মীর সাথে যোগাযোগ না করে শুধু আমার সঙ্গেই যোগাযোগ করেছিলেন, পুরো ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন আমি ইনসুলিন নিই, তাই আমার রক্তে অক্সিজেনের তারতম্যের কারণে ভাইরাসের কোন প্রভাব পড়বে না আমার ওপর।”
একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আবীর। সে বলল, “যাক! ডক্টর নীলকণ্ঠ দেবনাথ তাহলে অপরাধী নন।”

“অপরাধ তো তিনি অবশ্যই করেছেন।” ড. সাইফ রাজু গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, “দেশের শত্রুদের সাথে তো বটেই, মানবতার শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে তিনি জঘণ্য অপরাধ করেছেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি তার প্রায়শ্চিত্তও করেছেন। তাই তাকে ক্ষমা করা যেতেই পারে।”

১২.

একটা গোল টেবিলকে ঘিরে থমথমে মুখে বসে আছে তিনজন- প্রফেসর জাওয়াদ বিন রাজ্জাক, শীর্ষ সন্ত্রাসী সোলায়মান মোল্লা এবং পাকিস্তানী এজেন্ট ফাইজান খান। টেবিলের পাশে মাথা নীচু করে দাড়িয়ে আছে চারজন কালো পোশাকধারী গার্ড।

“তোমাদের চোখ এড়িয়ে ওরা এখানে ঢুকলো কেমন করে?” গার্ডদের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল ফাইজান খান।

“ওরা ছদ্মবেশে ছিল স্যার,” জবাবে একজন গার্ড বলল, “আর ভাইরাস আক্রান্তদের দলের সাথে ওরা এমনভাবে মিশে ছিল যে ওরা ঢোকার সময় আমরা ওদেরকে আলাদা করতে পারি নি।”

ফাইজান খান আগের মতই শীতল গলায় বলল, “তাহলে যখন বুঝতে পারলে তখন ওদেরকে আটকালে না কেন?”

“আমরা ওদের আটকাবার চেষ্টা করেছিলাম স্যার।” আরেকজন গার্ড কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলতে লাগলো, “কিন্তু আমরা যখন ওদেরকে ধরার জন্য তাড়া করলাম, তখন ওরা ল্যাবে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ল্যাবের দরজা ভেঙে যখন আমরা ঢুকলাম, ততক্ষণে ওরা জানালার গ্রিল কেটে সেখান থেকে পালিয়েছে।”

এবারে ফাইজান খানের চেহারায় রাগের চিহ্ন ফুটে উঠলো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে সে হুংকার দিয়ে উঠলো, “ইউ ইডিয়টস!! তোমরা পুরো বিল্ডিং ঘিরে ফেললে না কেন?!”

গার্ডটি প্রফেসর রাজ্জাককে দেখিয়ে দিয়ে বলল, “প্রফেসর সাহেব আমাদেরকে বলেছিলেন, ল্যাবরেটরী থেকে বের হওয়ার আর কোন রাস্তা নেই।”

ফাইজান খান শীতল দৃষ্টি নিয়ে তাকালো প্রফেসর রাজ্জাকের দিকে। ফাইজান খান কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই প্রফেসর রাজ্জাক কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "আসলে আমার খেয়াল ছিল না যে ল্যাবরেটরীর জানালার ঠিক পাশেই একটা বৈদ্যুতিক খুটি আছে, আর জানালার গ্রিল কেটে কেউ ঐ খুটি বেয়ে নেমে যেতে পারে।"

"এরকম আর কী কী তোমার খেয়াল নেই প্রফেসর??!!!" টেবিলের ওপর জোরে একটা থাবা দিয়ে গর্জে উঠলো ফাইজান খান।

"দুঃখিত মি. ফাইজান খান," মাথা নীচু করে বললেন প্রফেসর রাজ্জাক, "এরকম ভুল আর হবে না।"

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটলো। প্রফেসর রাজ্জাক-ই নীরবতা ভাঙলেন। তিনি বললেন, "পুরো কলেজে সি.সি. ক্যামেরা সেট করতে হবে, যাতে এরপরে আমাদের চোখ এড়িয়ে আর কেউ এখানে আসতে না পারে।"

"তো সেটা আগে কেন করো নি?" মেঘস্বরে বলল ফাইজান খান।

জবাবে প্রফেসর রাজ্জাক বললেন, "আগে তো ভাইরাসের এই ক্রুটি সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না মি. ফাইজান খান। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মাথায় এই বিষয়টা আসে নি যে কেউ এখানে আসতে পারে আমাদের পরিকল্পনা বানচাল করার পরিকল্পনা নিয়ে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু এরকমটা যেন আর কখনও না হয়।" চেয়ারে বসতে বসতে বলল ফাইজান খান। কিছু সময় চুপ করে থেকে সে বলল, "ওরা আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে গেছে। যারা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের ডেরায় আসতে পারে, আবার আমাদের হাত থেকে বেঁচে পালাতে পারে, তারা ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছুই করতে পারে।"

১৩.

“আমরা আসলে যাচ্ছিটা কোথায়?” অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল জোনাকি।

“আমার ধারনা ছিল এদিকটা তুমি চিনবে, যেহেতু তোমার চাচার অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা ছিল।” সামনের দিকে হাটতে হাটতে আবীর বলল।

“মানে?” অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জোনাকি।

“আমরা পতিতালয়ে যাচ্ছি।” উত্তরে আবীর বলল।

“পতিতালয়ে?!” জোনাকি যেন রীতিমত আকাশ থেকে পড়ল। সাইফ স্যার তাদেরকে পাঠিয়েছেন কয়েকজন সুস্থ মানুষ খোজার জন্য। আবীর পতিতালয়ে কেন যেতে চাইছে সেটাই ভেবে পাচ্ছে না জোনাকি। সে আবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল আবীর আসলে মজা করছে কিনা।

“হ্যা পতিতালয়ে।” জবাবে আবীর বলল, “দেহের বিনিময়ে সেখানকার বাসিন্দাদের পেট চলে।তাই অনেক সময় তারা নিজেদের দেহকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করার জন্য গরু মোটা তাজা করার ওষুধ ব্যবহার করে।”

“গরু মোটা তাজা করার ওষুধ?” চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করল জোনাকি, “মানে স্টেরয়েড??”

হ্যা-সূচক মাথা নাড়ল আবীর। তারপর সে বলল, “গতকাল রাতে যখন তুমি স্টেরয়েডের কথা বললে, তখনই আমার মাথায় এই বিষয়টা এসেছে।”

আবীরের কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ল জোনাকি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সারাদিন খুজলেও একজন-দু’জন কিংবা বড়জোর তিনজনের বেশি সুস্থ মানুষ পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। কোন পতিতালয়ে গেলে যদি একসঙ্গে পনেরো-বিশজনকে পাওয়া যায়, তাহলে মন্দ কী

একটা গলির সামনে এসে দাড়িয়ে গেল আবীর। তার দেখাদেখি জোনাকিও দাড়িয়ে গেল। গলিটা বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে শুধু এই গলিটার ভেতরে তাকালে বোঝার কোন উপায় নেই যে এখন দিন না রাত! এমনিতে সাধারণত এই গলির মুখে বিভিন্ন বয়সের কয়েকজন মহিলাকে দাড়িয়ে থাকতে দেখা যায় গাহাকের খোঁজে। কাউকে এদিকে আসতে দেখামাত্রই তারা প্রস্তুত হয়ে যায় দরদাম করার জন্য। একজন পতিতার একদিন কোন গাহাক না পাওয়া মানে হল সেদিন সারাদিন পেটে পাথর বেঁধে পড়ে থাকা। কারণ গাহাকের টাকার ওপর তাদের পেট চলে। কিন্তু আজ এই গলিতে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। গলি দিয়ে পতিতালয়ের ভেতরে গিয়েও যদি কাউকে পাওয়া না যায়? প্রমাদ গুণলো আবীর।
“ওদের সাথে তুমি কথা বলবে।” একটা ঢোক গিলে বলল আবীর, “ঠিক আছে?”
“আমি কী কথা বলব?!” অবাক হয়ে বলল জোনাকি।
“যে কারণে আমরা এখানে এসেছি সেটাই বলবে।” আবীর বলল, “একটা ছেলের চাইতে একটা মেয়ের কথাকে ওরা বেশি সহজভাবে নেবে।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো জোনাকি। তারপর আবীর গলি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে শুরু করলে জোনাকিও তার পেছন পেছন হাটা ধরল। গলিটা এতই সরু যে একসঙ্গে দু’জন ঢোকা অসম্ভব। হাটতে হাটতে একসময় গলির অপর প্রান্তে পৌছানোর পর তারা দেখতে পেল সারি সারি অনেকগুলো ঘর। ঘর বললে অবশ্য ভুল-ই হবে। ভাঙাচোরা মর্চে পড়া টিন আর কয়েকটা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি এবং কিছু জায়গা ছেড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঢাকা এই কুড়েঘরগুলো কেবল থাকার অনুপযোগী-ই নয়, প্রচণ্ড রকমের অস্বাস্থ্যকরও। এখানে মানুষ কেমন করে থাকে কে জানে!
“আশেপাশে তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না!” ভয়ে ভয়ে বলল জোনাকি।
কাউকে দেখতে না পেয়ে আবীরও খানিকটা হতাশই হল। হতাশ গলায় সে বলল, “তাই তো দেখছি। চলো ঘরগুলোর ভেতরে গিয়ে দেখি।”

আবীর আর জোনাকি হাটতে হাটতে একটা ঘরের দরজার সামনে এসে দাড়ালো। পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল তারা। জোনাকি আস্তে করে দরজায় একটা ধাক্কা দিতেই দরজাটা হাট করে খুলে গেল। তারপর দরজা দিয়ে ভেতরে উকি দিলো সে।

“কেউ তো নেই ভেতরে!” জোনাকি গুঙিয়ে উঠলো।

“চলো,” আশা নিয়ে বলল আবীর, “অন্য ঘরগুলোতে দেখা যাক।”

পাশ ফিরে তাকাতেই থমকে দাড়ালো আবীর আর জোনাকি। একজন মহিলা কোমরে হাত দিয়ে দাড়িয়ে কটমট করে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

“কারে চান?” জিজ্ঞেস করল মহিলাটি।

“জী... মানে আসলে...” আমতা আমতা করে বলল আবীর, “আমরা আপনাদের কাছেই এসেছি।”

মহিলাটি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে একবার আবীরের দিকে আর একবার জোনাকির দিকে তাকালো। তার চোখে সন্দেহ। জোনাকি আর আবীরকে পালা করে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে হাক দিলো সে, “খালা! ও খালা! বাইরে আহো, কারা জানি আইছে আমাগো কাছে!”

তার ডাক শুনে আশেপাশের ঘরগুলো থেকে বিভিন্ন বয়সী আরও কয়েকজন মহিলা বেরিয়ে এলো। কৌতুহলী দৃষ্টিতে সবাই তাকালো আবীর আর জোনাকির দিকে, খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগলো তাদের দু’জনকে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দু’জনকে পর্যবেক্ষণ করার পর তারা ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলো।

-“এই পোলাডা কি আমগো নতুন কাষ্টমার নাকি? কয়দিন ধইরা তো কোন কাষ্টমারই আহে না, আর ঘরে একটা চাউলও নাই!”

-“ধুর! এইডা তো বাচ্চা পোলা! আমার পোলাডা বাইচা থাকলে এতদিনে অর সমান হইয়া যাইত। আহারে!”

-“কাষ্টমার না হইলে এইহানে আইছে কী করতে?”

-“দ্যাখ দ্যাখ! লগে একটা মাইয়াও আছে!”

-“মাইয়াডারে বেচতে আনছে মনে হয়।”

-“ক্যার কাছে বেচব?! মহাজনেরই তো কোন খবর নাই!”

-“কে জানে! হালার পুরুষ মাইনষের জাত! আমরারে বুকে টাইনা লইতেও সমায় লাগে না, ফালায় দিতেও সমায় লাগে না। আবার বাজারে বেইচা দিতেও সমায় লাগে না!”

আবীর অবাক হয়ে শুনছিলো তাদের কথাবার্তা। এখানকার মহিলারা সারাজীবন এতটাই নির্যাতিত হয়ে এসেছে যে এখন গোটা পুরুষ জাতির প্রতি তাদের মনে কেবল একটাই অনুভূতি কাজ করে, আর সেটা হল ঘৃণা। কারণ এদের এই অবস্থার জন্য এক শ্রেণীর পুরুষরাই দায়ী। তারাই এদেরকে এই পথে নামতে বাধ্য করেছে।

-“কী হইছে রে ময়না? ডাক পাড়তাছস ক্যান?”

একটা রাশভারী নারীকণ্ঠ শুনে ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকালো আবীর। দেখলো একজন বয়স্ক মহিলা হেটে আসছে এদিকেই। তার চেহারায় এক অদ্ভুত রকমের গাম্ভীর্য। আবীর লক্ষ্য করল, তাকে আসতে দেখেই অন্য মহিলারা নিজেদের ভেতর কথাবার্তা বন্ধ করে দিলো।

“খালা,” আবীর আর জোনাকিকে দেখিয়ে ময়না বলল, “ইনারা নাকি আমাগো কাছে আইছে।”

পাশে থেকে আরেকজন বলে উঠলো, “দ্যাখো খালা, লগে একটা মাইয়াও আছে। বেচতে আনছে মনে হয়!”

“না না!” না-সূচক মাথা নেড়ে বলে উঠলো আবীর, “আমরা আসলে আপনাদের কাছে অন্য একটা কাজে এসেছি।”

খালা ভ্রু কুচকে তাকালো আবীরের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, “কী কামে?”

আবীর বুঝতে পারছে না কী দিয়ে কথা শুরু করবে। আবীরকে চুপ করে থাকতে দেখে জোনাকি বলতে শুরু করল, “আসলে..... আমরা সবাই এখন অনেক বড় একটা বিপদের মাঝে আছি। এই বিপদের মধ্যে আমাদের একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব না। তাই আপনার- মানে আপনাদের কাছে এসেছি সাহায্যের জন্য।” একটু

থেমে সবার দিকে একবার দেখে নিয়ে তারপর আবার খালার দিকে তাকালো জোনাকি, বলল, "আপনাদের সবার সাহায্য এখন খুবই প্রয়োজন আমাদের!"
খালার চোখে তখনও সন্দেহ। জোনাকির আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে তারপর বললেন, "আমরা আপনেগো লেইগা কী করতে পারি?"
"আমার মনে হয়," জোনাকি বলল, "আমাদের একটা জায়গায় বসে কথা বলা উচিত। কারণ পুরো ব্যাপারটা দুই এক কথায় বলে শেষ করা যাবে না।"

খালা তার চোখ দু'টো সরু করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো জোনাকির দিকে, তারপর অত্যন্ত শীতল গলায় বলল, "ঠিক আছে। আপনেরা তাইলে আমার ঘরে আসেন।"

****

"স্যার," ক্লান্ত স্বরে বলল দীপ, "আড়াই ঘণ্টা হতে চলল, এখন পর্যন্ত তো একটাও জীবিত মানুষের দেখা মিলল না!"
"আশা ছেড়ো না, খুজতে থাকো।" চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বললেন ডক্টর সাইফ রাজু, "আমার ধারনা এখানটায় আমরা কয়েকজনকে পেয়েও যেতে পারি।"
দীপের প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। পকেট থেকে দ্রুত ইনহেলারটা বের করে মুখের মধ্যে দু'বার স্প্রে করল সে।
"উফ! এখানে এত দুর্গন্ধ!" ডান হাতে নাক ঢেকে বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল দীপ।
"এই দুর্গন্ধের কারণেই তো আমি আশাবাদী যে এখানে কয়েকজন জীবিত মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে।" বিড়বিড় করে বললেন সাইফ রাজু, "গাঁজার গন্ধ। তারমানে এই বস্তিতে অনেক ড্রাগ এডিক্টেড থাকে!"

প্রফেসর সাইফ রাজু দীপকে নিয়ে একটা বস্তিতে এসেছেন ড্রাগ এ্যাডিক্টেডদের খোঁজে। ড্রাগ নেয়ার কারণে তাদের রক্তে অক্সিজেনের তারতম্য থাকবে, যার কারণে

তারা ভাইরাসের প্রভাবমুক্ত। এখানে তাদেরকে খুজতে আসার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দল ভারি করা। দুশ্চিন্তা কেবল একটা বিষয় নিয়েই, নেশায় বুদ হয়ে থাকা মানুষগুলোকে তারা কীভাবে বোঝাবে দেশের অবস্থা??!!!

"কে যায় রে?!"

চারিদিকের সুনসান নীরবতার মাঝে হঠাৎ একটা ফ্যাসফ্যাসে গলার স্বর শুনে চমকে উঠলেন সাইফ রাজু। দীপ ভয়ে রীতিমত লাফিয়ে উঠলো। বিড়বিড় করে হনুমান চলিসা আউড়াতে লাগল সে। শব্দ যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকাতেই সাইফ রাজু দেখতে পেলেন, একটা টিনের ঘরের দরজা দিয়ে একজন লোক বেরিয়ে এসেছে। লোকটির দেহ হাড্ডিসার, গাল ভাঙা; পরনে লুঙ্গি এবং বাদামী রঙের একটা শার্ট। লোকটির পেছন পেছন আরও একজন বেরিয়ে এলো, তার পরনে একটা কালো টি-শার্ট এবং রংচটা একটা জিন্সের প্যান্ট।

"শিয়াল টিয়াল মনে হয়।" দ্বিতীয়জন মাথা চুলকে বলল। সে ঘোর লাগা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

"ধুর ব্যাডা!" প্রথমজন ধমকে উঠে বলল, "ঢাকা শহরে শিয়াল আইব কইত্তন?! দুইডা জ্যাতা মাইনষের মতই তো দেহা যায়!"

প্রফেসর সাইফ এগিয়ে গেলেন লোকটির দিকে, তার পেছন পেছন এগিয়ে গেল দীপও। সে এখনো হনুমান চলিসা আউড়ে যাচ্ছে বিড়বিড় করে। সাইফ স্যার গলা খাকারি দিলেন, যেন কিছু বলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

"আপনে কেডা?" লোকটি অবজ্ঞার সুরে বলল, "আর পোলাডা এমন করে ক্যান? বাবা খাইছে নি?!"

"আমি ড. সাইফ রাজু," নিজের পরিচয় দিয়ে সাইফ রাজু বললেন, "এখানে এসেছি আপনাদের সাথে দু'টো কথা বলতে। আপনি কি এখানেই থাকেন?"

এবারে লোকটি সাইফ রাজুর আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিলো। তারপর বলল, "হ। কিন্তু আমাগো লগে কী কথা?"

সাইফ স্যার জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা কতজন আছেন এখানে?”
“বস্তির মানুষগুলার কী হইছে কে জানে!” লোকটা গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, “এহন আছি আমরা জনা বিশেকের মতন।”
সাইফ স্যার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে বললেন, “এতেই চলবে! আমি কি আপনাদের সবাইকে একটি বার একসঙ্গে পেতে পারি? আসলে কথাগুলো আমি সবাইকে একসঙ্গে বলতে চাচ্ছি।”
লোকটি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সাইফ স্যারের দিকে। তারপর বলল, “আহেন আমার লগে।”

লোকটি ঘরের দরজা বন্ধ না করেই একদিকে হাটা ধরল, যেন ঘর খোলা থাকলে কিছুই আসবে যাবে না! লোকটির পাশে পাশে হাটতে লাগল দ্বিতীয় লোকটি। সাইফ স্যার তাদের দু’জনকে অনুসরণ করতে লাগলেন, তার পেছন পেছন দীপও।
“মামা। ইনারা কারা?” দ্বিতীয় লোকটি গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল।
“জানি না। নতুন পার্টি মনে হয়।”
“কিন্তু লগে তো জিনিস পাতি কিছু দেহি না!”
“চুপ থাক!” বিরক্ত হয়ে বলল প্রথম লোকটি, “আগে দেহি কী কয়।”

সাইফ স্যার তাদের কথায় কান না দিয়ে চুপচাপ তাদের পেছন পেছন হাটতে লাগলেন। তারা যে কোথায় যাচ্ছে সেটা তারাই জানে! হাটতে হাটতে দীপ এবং সাইফ রাজু দু’জনেই যখন হাপিয়ে উঠলেন, তখন তারা দু’জন ঝুপরি মতন একটা ঘরের সামনে দাড়িয়ে গেল। ঘরের দরজা সামান্য ফাক করা। ভেতর থেকে কিছু লোকের কথা বলার আওয়াজ ভেসে আসছে। প্রথম লোকটি সাইফ স্যারের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। তারপর লোকটি তার সাগরেদকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তার পেছন পেছন সাইফ স্যারও দীপকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

ভেতরে ঢুকতেই একটা বিকট গন্ধ এসে আঘাত করল নাকে। দীপ দু'হাতে নাক ঢাকলো। সাইফ স্যার পুরো ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। ঘরের ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানান বয়সের প্রায় বিশ-পঁচিশজন মানুষ। কেউ কেউ সিগারেট ফুকছে, কেউ বা সিরিঞ্জ দিয়ে ড্রাগ নিচ্ছে। ঘরের এক কোণে একটা ছেলের ওপর চোখ আটকে গেল সাইফ স্যারের। ছেলেটার বয়স আঠারো-উনিশ বছর হবে। তার চোখে চশমা, গায়ের জামাকাপড় বেশ ভদ্র গোছের। অনেকদিন ধরে শেভ না করার কারণে তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ ভদ্র ঘরের ছেলে।

যে লোকটি ডক্টর সাইফ আর দীপকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে, সে গলা খাকারি দিলো সবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। তারপর বলল, “এই স্যার আমাগো সবার লগে কী জানি কথা কইতে চায়।” তারপর সাইফ স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, “নেন স্যার, কী কইবেন অহন কইয়া ফালান।”

সবাই কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাইফ স্যারের দিকে। কয়েকজন আবার নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে, সম্ভবত সাইফ স্যারকে নিয়েই। সাইফ স্যার কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, “আমার নাম ডক্টর সাইফ রাজু। আজ আমি আপনাদের এখানে এসেছি আমাদের দেশের অনেক বড় একটা সমস্যা নিয়ে কথা বলতে এবং আপনাদের সবার সাহায্য চাইতে। আপনারা কী জানেন, আমাদের দেশের এখন কী অবস্থা?”

“হ জানি।” একজন বলে উঠলো। সাইফ স্যার বেশ অবাক হয়েই তাকালেন লোকটির দিকে। লোকটি বলল, “দ্যাশের বেবাক মাইনষের উপর জ্বীনের আছড় হইছে। যারে সামনে পাইতাছে তারেই মাইরা ফালাইতাছে! আমাগো দুইজন অগো হাতে মরছে।”

লোকটির কথা শুনে দীপের প্রচণ্ড হাসি পেলেও পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে হাসি চেপে রাখলো। সে জানে, হাসাহাসির সময় এখন না। সাইফ স্যার গম্ভীর স্বরে বললেন, “হ্যা। আর এখন সেই জ্বীনকে তাড়াতে পারেন আপনারাই।”

সাইফ স্যারের কথা শুনে সবার চোয়াল ঝুলে পড়ল, তারা যেন ঠিক বুঝতে পারছে না সাইফ স্যার কী বলছেন। কয়েকজন তো হেসে গড়িয়েই পড়ল। সাইফ স্যার সেদিকে না তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন, “শুধু আমাদের দেশ না, পৃথিবীর চৌদ্দটি দেশের মানুষ এক ভয়াবহ ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত! কেউ রক্ষা পায় নি এই ভাইরাসের হাত থেকে। শুধুমাত্র যাদের রক্তে অক্সিজেনের তারতম্য আছে, তারাই এই ভাইরাসের প্রভাব থেকে মুক্ত। যেমন আপনারা। আপনাদের রক্তে অক্সিজেনের তারতম্যের কারণে ভাইরাসের কোনো প্রভাব নেই আপনাদের ওপর।”

মানুষগুলো কিছু বুঝল বলে মনে হল না, তারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল প্রফেসর সাইফ রাজুর দিকে। কেবল চশমা পড়া ছেলেটা একটু নড়ে চড়ে বসল।
“আমার যদি ভুল না হয়,” ছেলেটি ধীরে বলল, “তাহলে আপনি ডক্টর সাইফ রাজু। তাই না?”
ড. সাইফ রাজু বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, “হ্যা।”
“আচ্ছা স্যার,” ছেলেটি আগের মতই শান্ত স্বরে বলল, “আপনার কী মনে হয়, আমার বাবা মাও কি এই ভাইরাসের শিকার হয়েছেন?”
“হয়ত হয়েছেন।” অনিশ্চিতভাবে বললেন সাইফ রাজু।
“ভালোই হয়েছে!” সবাইকে অবাক করে দিয়ে একগাল হেসে ছেলেটি বলল, “তারা যখন আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলো, তখন একটা বারের জন্যও কি ভেবেছিলো যে আমি কোথায় যাব? ভাবে নি! তাহলে আজ আমি কেন তাদের কথা ভাববো?”
সাইফ স্যার মুখ শক্ত করে বললেন, “তোমার নাম?”
“এরিক।” ছেলেটি নিজের নাম বলল।

“তোমরা কয় ভাই-বোন এরিক?” সাইফ স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

“এক বোন আর আমি একা।” এরিক বুঝতে পারছে না সাইফ স্যার হঠাৎ এসব কেন জানতে চাচ্ছেন।

“তারমানে তুমি তোমার বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে।” গলার স্বর নরম করে সাইফ স্যার বললেন, “একবারও কি ভেবে দেখেছো, পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে গিয়ে দাড়ালে বাবা-মা তাদের একমাত্র ছেলে বা মেয়েকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন? তাদের দিক থেকে একবারও ভেবেছো ব্যাপারটা?”

এরিক কোন কথা বলল না, কেবল শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সাইফ স্যারের দিকে। তার মুখে কোন অনুভূতি প্রকাশ না পেলেও তার নীরবতাই বলে দিচ্ছে যে তার মনের ভেতরে ঝড় বয়ে চলেছে।

সাইফ স্যার হয়ত এরিক নামের এই ছেলেটিকে আরও কিছু বলতেন, কিন্তু তার আগেই লোকগুলোর মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করে উঠলো, “এখন আমাদের কী করতে বলেন? আমাদের কাছে কী চান?”

“সাহায্য চাই।” সাইফ স্যার অনুনয় করে বললেন, “দেশের মানুষগুলোকে এই ভাইরাসের কবল থেকে বাঁচাতে হবে!”

একজন সিগারেট ফুকতে ফুকতে বলল, “আপনেরা বাচান গিয়া। আমাগোরে টানেন ক্যান?”

“হ। আমরা এইসবের মধ্যে নাই।” আরেকজন সায় দিয়ে বলল।

সাইফ স্যার মরিয়া হয়ে বললেন, “আপনাদের সবার সাহায্য না পেলে আমরা কীভাবে কী করব? আপনারা কি বুঝতে পারছেন, আমাদের দেশ একটা আন্তর্জাতিক শক্তির দখলে চলে যাচ্ছে? তারা আমাদের দেশের মানুষগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চাচ্ছে! বুঝতে পারছেন আপনারা?!”

“করুক।” একজন দায়সাড়াভাবে বলল, “তাতে আমাদের কী?”

“আপনাদের কী মানে?” সাইফ স্যার রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন, বললেন, “আরে ভাই দেশটা তো আপনাদেরও! ওরা অন্যায়ভাবে এই দেশের দখল নিয়ে নেবে, দেশের মানুষগুলোকে নিজেদের হাতের পুতুল বানিয়ে যা খুশি তাই করাবে, সেটা আপনারা মেনে নেবেন??”
একজন দাঁত কেলিয়ে বলল, “আমরা তো ভালই আছি। আমরা আমাগো মত থাকুম, অরা অগো মত থাকব। আমরা অগোরে না ঘাটাইলেই হয়!”
“হ।” আরেকজন পাশে থেকে সম্মতি জানিয়ে বলল, “আমাগো জিনিস থাকলেই হইল। আর কী লাগে?”
“আপনাদের তাই মনে হয়?” সাইফ স্যার ভ্রূ কুচকে বললেন, “আপনারা যদি ভেবে থাকেন ওরা আপনাদেরকে আপনাদের মত থাকতে দেবে, তাহলে আপনাদের ধারণা ভুল। আপনারা শান্তিতে নেশাও করতে পারবেন না, কারণ ওরা আপনাদেরকে সেটাও করতে দেবে না!”

সাইফ স্যারের কথায় যেন ম্যাজিকের মত কাজ হল। সবকটা চোখ একসঙ্গে ঘুরে গেল তার দিকে। কম বয়সী একটা ছেলে কাচের শিশি থেকে সিরিঞ্জে কিছু ভরছিলো, সে সিরিঞ্জটা ফেলে এক লাফে উঠে দাড়ালো। রাগে ফুসতে ফুসতে সে জিজ্ঞেস করল, “কী বললেন?”
“বললাম,” সাইফ স্যার বেশ শান্ত স্বরে বললেন, “ওরা তোমাদেরকে নেশাও করতে দেবে না। বাইরের দেশের কেউ তোমাদের কাজকর্মে বাধা দেবে, তাদের বাধা না মানলে অত্যাচার করবে, তোমাদের ভালো লাগবে সেটা?”
ছেলেটির পাশে বসা লোকটিও উঠে দাড়ালো। রাগে ফেটে পড়ে সে বলল, “অগো এত্ত বড় সাহস অরা আমাগো বাধা দিব? অরা কারা বাধা দেওনের?”

সাইফ স্যার বুঝতে পারলেন, এটাই মোক্ষম সুযোগ এদেরকে হাত করার। তিনি বললেন, “ওরা তো সেরকমই বলেছে। ওরা বলেছে, এই দেশ এখন ওদের দখলে, তাই ওরা যা বলবে তাই হবে। এই দেশে নাকি নেশা করা নিষিদ্ধ!”

“অরা কারা নিষিদ্ধ করনের?!” লোকটি রীতিমত চিৎকার করে উঠলো, “অরা কি এই দ্যাশের পেসিডেন্ট??”

সাইফ স্যার হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, “ক্ষমতা তো এখন ওদেরই হাতে!”
যেই লোকটি সাইফ রাজু আর দীপকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলো, সে এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনছিলো। সে ফুসে উঠে বলল, “আমার দ্যাশে আমি নেশা করি, ঐ শালাগো বাপের টেকায় নেশা করি নাকি?”
“হ,” অন্য একজন সায় দিয়ে বলল, “আমাগো দেশে আমরা বাবা খাইলে অগো জ্বলে ক্যা? ধরলে আমাগো দেশের পুলিশে ধরব, পিডাইলে আমাগো দেশের পুলিশে পিডাইব, মাইরা ফালাইলেও আমাগো দেশের পুলিশেই মারুক! কিন্তু বাইরের মাইনষে আইয়া নাক গলাইব ক্যা?!”

একটা ছেলে তার হাতের সিগারেট ফেলে সহমত প্রকাশ করে বলল, “আমাগো বিচার আমাগো পুলিশেই করব। বাইরে থিকা যদি কেউ নাক গলায় তয় নাক কাইট্টালামু কইলাম!”

তাদের কথাবার্তা থেকে যা বোঝা যাচ্ছে তা হল, তাদের নেশা করার ব্যাপারে বাইরের দেশের হস্তক্ষেপ তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না। তারা এদেশের পুলিশের হাতে মার খেতেও প্রস্তুত, কিন্তু অন্য কোন দেশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে কেউ তাদের ওপর ছড়ি ঘোরাবে, সেটা তারা হতে দেবে না। তাদের কথাবার্তায় কয়েক মুহুর্তের জন্য হলেও মনে হল এদেশের পুলিশ যেন তাদের কত আপনজন!
মাঝবয়সী একজন লোক উঠে দাড়িয়ে টলতে টলতে এগিয়ে এলো প্রফেসর সাইফ রাজুর কাছে। সে বলল, “স্যার, আমরা আছি আপনাগো লগে। অই হারামজাদাগোরে খেদাইতে যা করা লাগে করমু!”

****

জোনাকি তার কথা শেষ করে খালার দিকে তাকালো, তিনি কিছু বলবেন এই আশায়। কিন্তু খালা কিছুই বললেন না। তার আশেপাশে দাড়ানো মহিলারা মুখ টিপে হাসছে। কয়েকজন আবার নিজেদের মধ্যে কানে কানে কথা বলছে। খালার পেছনে দাড়িয়ে থাকা ময়না আর চুপ করে থাকতে পারল না, শব্দ করে হেসে উঠলো।

"হুনছো নি খালা?" হি হি করে হাসতে হাসতে ময়না বলল, "পোলাপানের কথা হুনছো?! তেনারা দ্যাশের কাজে নামছে! আর আমাগোও বলে দ্যাশের কাজে নামাইব!"

একজন মহিলা আড়চোখে আবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই ধান্দাবাজগুলারে বিশ্বাস কইরো না খালা! সমাজসেবা এগো ব্যবসা। সমাজসেবায় নাইমা দুনিয়ার আকাম কইরা বেড়ায়।"

তার কথায় সায় দিয়ে আরেকজন বলল, "হ। বারো বছর আগে আমাগো গেরামেও এমন দুইজন আইছিলো, কইছিলো গেরামের মাইয়াগো শহরে নিয়া কাম দিব, আবার লেখাপড়াও করাইব। বাপ মায় কত ভরসা কইরা আমাগো তুইলা দিছিলো হেগো হাতে। আর হেরা আমাগো শহরে আইনা একেকজনরে একেক জায়গায় বেইচা দিলো! শুয়ারের বাচ্চারা!!"

"কত্ত নেতারা বক্তিতা দিয়া দ্যাশ উদ্ধার কইরা ফালায়, নারীর অধিকার লইয়া চিল্লায়, আবার রাইত হইলেই তো আমাগো কাছে দৌড়ায়!" মুখ বাকিয়ে বলল আরেকজন।

আরেকজন আবার বলল, "এহন আর বদমাইশগুলায় নিজেরা আহে না, ছোড ছোড পোলাপান পাডায়! এইগুলাও বড় হইয়া অগো মতই হইব!"

"দেখুন," জোনাকি অধৈর্য হয়ে বলল, "আপনারা আমাদের সম্পর্কে যা ভাবছেন আমরা মোটেও সেরকম কিছু না! আমরা তো আপনাদেরকে সবই বললাম, ঐ ভয়ানক ভাইরাসের আক্রমণ থেকে আমরা ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছি! কিন্তু যারা এই ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত, তাদের হাত থেকে কতদিন পালিয়ে বাঁচব? তারা একজন

সুস্থ মানুষ দেখা মাত্রই মেরে ফেলছে! তাদের হাত থেকে বাচতে হলে আমাদের তাদেরকে বাঁচাতে হবে। আর সেজন্যেই আপনাদের সবার সাহায্য দরকার।”
“আমরা বিশ্বাস করি না!” মুখ ঝামটা দিয়ে বলল একজন।

জোনাকি তবুও হাল ছাড়ল না, তাদের বোঝানোর চেষ্টা করে বলল, “আমাদের অনেক কাছের মানুষেরাও আজ এই এফিব্যান ভাইরাসে আক্রান্ত। হয়ত আপনাদের অনেক আপনজনেরাও আছেন এদের মধ্যে। তাদের কথা তো অন্তত একবার ভাবুন!”
“আমরার আবার কাছের মানুষ!” হাসার ভঙ্গি করে একজন মহিলা বলল, “যারা আমরারে বেশ্যা কইয়া দূরে ঠেইলা দিছে, হেরা আবার আমরার কাছের মানুষ! থুঃ!” কথাটা বলে সত্যি সত্যি মাটিতে এক দলা থুতু ফেলল সে।

ময়না হাহাকার করে বলল, “চাইছিলাম তো এই জাহান্নাম ছাইড়া বাপ মার কাছে ফির্যা যাইতে! কিন্তু এই সমাজ আমাগো বার বার লাত্থি মাইরা এইহানেই ফিরত পাডাইছে!” কথাটা বলে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল ময়না, তারপর বলল, “এহন উচিত বিচার হইছে, আল্লার গযব পড়ছে এই সমাজের উপর!”

আবীর এতক্ষণ চুপচাপ সবকিছু শুনছিলো। এবারে সে মুখ খুলল, “আপনাদের কষ্ট আমরা বুঝি। এই সমাজ আপনাদের সাথে আসলেই অনেক অন্যায় করেছে। আর যাদের জন্যে আজ আপনারা এই অন্ধকার জগতে আটকা পড়েছেন, তাদের অবশ্যই কঠিন থেকেও কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত! কিন্তু তাই বলে তাদের সাথে সাথে আমাদের মত নিরপরাধ মানুষগুলোকেও যদি শাস্তি ভোগ করতে হয়, সেটা কি ঠিক হবে?”
“আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি,” বেশ জোর দিয়েই বলল জোনাকি, “আপনারা আবার আপনাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবেন। আমরা আপনাদেরকে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেব।”

খালা এবারে একটু নড়ে চড়ে বসলেন। খুক খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন। সবকটা চোখ একসঙ্গে ঘুরে গেল খালার দিকে, সবাই বুঝতে পারল খালা এখন কিছু একটা বলবেন।

খালা একবার আবীরের দিকে আর একবার জোনাকির দিকে তাকালেন। তারপর বেশ মোলায়েম স্বরে বললেন, “মনে করো আমরা সবাই তোমাগো সাহায্য করলাম। কিন্তু তোমাগো কী মনে হয়, তোমরা পারবা এই দ্যাশটারে বাচাইতে?”

খালার কথার অর্থ জোনাকি ঠিক বুঝতে পারল না, সেটা বুঝতে পেরেই খালা আবার বললেন, “আমি তো মুরুখ্য মানুষ, তোমাগো লাহান অতকিছু জানি না। কিন্তুক এইডা বুঝতাছি যে দ্যাশে যা কিছু হইতাছে তার পিছনে অনেক বড় কারো হাত আছে। তাগো অনেক ক্ষ্যামতা! আমাগো মুখের কয়েক দলা ছ্যাপ দিয়া কি আর তাগো আটকান যাইব?”
“হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে এমনিতেও তো আমাদের মরতেই হবে।” জোনাকি বলল, “তাহলে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? আমরা একা হয়ত কিছুই করতে পারব না, কিন্তু আপনারা সবাই যদি সাহায্য করেন তাহলে কিছু একটা যে অন্তত করা যাবে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।”

এই প্রথমবার খালার মুখে বিচিত্র এক ধরনের হাসি ফুটলো। সেই হাসি ধরে রেখেই তিনি বললেন, “তোমাগো বয়সে থাকতে কত রকম স্বপ্ন যে দেখতাম! সব তো চূলায় গেল! কিন্তুক তোমাগো স্বপ্নও চূলায় যাউক হেইডা আমি চাই না। আমরা আছি তোমাগো লগে।”

আবীর তখনও বিস্ময় ঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে খালার অবাক করা হাসিমুখের দিকে। হাসলে যে একটা মানুষকে এতটা সুন্দর লাগতে পারে, সেটা তার জানা ছিল না।

১৪.

“সোলায়মান।”

বসে বসে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে নাকের পশম ছিড়ছিলো সোলায়মান মোল্লা, ফাইজান খান কখন যে তার পেছনে এসে দাড়িয়েছে সে খেয়ালও করে নি। ফাইজান খানের রাশভারি কণ্ঠে তার ধ্যান ভাঙলো। দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে স্যালুট করার মত ভঙ্গি করল সে।

ফাইজান খানের চেহারায় বিরক্তির ছাপ পড়ল, সেটা ধরে রেখেই শীতল গলায় সে বলল, “সোলায়মান, তোমাকে কী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো?”

সোলায়মান আমতা আমতা করে বলতে লাগল, “ইয়ে স্যার... মানে...”

সোলায়মানকে কথা শেষ করতে দিল না ফাইজান খান, ধমকে উঠে বলল, “আমি কোনো কৈফিয়ত শুনতে চাই না! আমি চাই কাজ।আমি তোমাকে বলেছিলাম দেশের কোথাও যেন কোনো সুস্থ মানুষ না থাকে, ভাইরাসের প্রভাবমুক্ত একটা জীবিত মানুষও যেন না থাকে! বলেছিলাম কিনা?”

“জে স্যার, বলছিলেন।” মুখ কাচুমাচু করে জবাব দিলো সোলায়মান।

“আর তুমি সে ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিয়েছ? এখনও পর্যন্ত কাজের কোন নামগন্ধও নেই!” হিস হিস করে বলল ফাইজান খান। তারপর দু’হাত পেছনে নিয়ে ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পায়চারি করতে শুরু করল সে, পায়চারি করতে করতে সে বলল, “এবার এখানে দুইজন এসেছে, এর পরেরবার যদি দুই হাজার চলে আসে, ক’জনকে ঠেকাবো আমরা? আমাদের সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে, রাজত্ব করার আশা ছেড়ে দিয়ে পথে বসতে হবে তখন! আর মাস্টার ক্রুগোও কি আমাদের ছেড়ে দেবেন মনে করেছ?”

মাস্টার ক্রুগোর নাম শুনে শিউরে উঠলো সোলায়মান মোল্লা। মাস্টার ক্রুগো সম্পর্কে আর কিছু না হোক একটা ব্যাপার সোলায়মান বেশ ভালো ভাবেই জানে। মাস্টার ক্রুগোর কাজে ব্যর্থ হওয়ার একটাই পরিণতি, আর সেটা হল মৃত্যু। তিনি কাউকেই দ্বিতীয়বার সুযোগ দেন না।

"স্যার, আপনে এক্কেবারে চিন্তা নিয়েন না!" সোলায়মান মোল্লা ফাইজান খানকে আশ্বস্ত করে বলল, "আমি আইজকের মইধ্যেই একটা ব্যবস্থা নিতাছি। কিন্তু স্যার...."

"আবার কিন্তু কী?" ভ্রু কুচকে বলল ফাইজান খান।

সোলায়মান ইতস্তত করে বলল, "প্রফেসর সাবের ব্যাপারডা..."

সোলায়মানকে থামিয়ে দিয়ে ফাইজান খান কঠিন গলায় বলল, "প্রফেসরকে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কাজ করো।"

ধমক খেয়ে চুপসে গেল সোলায়মান। সে ফাইজান খানকে একটা স্যালুট করে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে একটা চুরুট ধরালো ফাইজান খান। তার মাথায় একসঙ্গে অনেক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। কিছুতেই মনকে স্থির রাখতে পারছে না সে। বাঙালিদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে হলে তাদের মুখ বেশি চলতে দেয়া যাবে না। কিন্তু তবুও কেন যেন তার মনে হচ্ছে যে সোলায়মান মোল্লাকে তার কথা শেষ করতে দেয়া উচিত ছিল। প্রফেসর রাজ্জাক সম্পর্কে কী বলতে চাচ্ছিলো সোলায়মান মোল্লা?

১৫.

আবীর, দীপ আর জোনাকি অবাক হয়ে সবার কাজ দেখছে। কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত এই মানুষগুলো তাদের সঙ্গে আসতেই রাজি ছিল না! অথচ এখন এরাই ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে কাজ করছে!

খালা ঘরের মাঝখানে একটা বড় ড্রামের পাশে দাড়িয়ে রয়েছেন, তার হাতে একটা প্যাড আর একটা কলম। সেই প্যাডে আবীর এখানকার সবার নাম লিখে দিয়েছে। ড্রামের সামনে সবাই লাইন ধরে দাড়িয়ে একজন একজন করে থুতু ফেলছে, আর খালা প্রত্যেকের নামের পাশে টিক চিহ্ন দিয়ে রাখছেন।

ঘরের এক কোণে বসে কমবয়সী দু'টো ছেলে মিলে একটা পুরনো স্টোভ ঠিক করার চেষ্টা করছে। দু'জনের মধ্যে একজনের নাম রায়হান, তার সাথে আবীর আর দীপের কথা হয়েছে। আজ থেকে দুই বছর আগে বাসা থেকে পালিয়েছিল রায়হান, তারপর আর ফিরে যায় নি। তার বাসা থেকে পালানোর কারণ- এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট। ভবঘুরের মত এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে পড়ে যায় এক মাদক ব্যবসায়ীর হাতে। তারপর বাকিটা ইতিহাস।

দরজার পাশে দু'টো বস্তা রাখা আছে। বস্তা দু'টোর একটিতে চাল, অন্যটিতে ডাল। মকবুল, কাসেম আর রাশেদ- যারা পেশায় ছিচকে চোর, তারা এগুলো এনেছে একটা পরিত্যক্ত দোকান থেকে চুরি করে। অন্য সময় হলে ব্যাপারটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ত, কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন।

এরিক একটা ফার্মেসীর তালা ভেঙে অনেক ওষুধ নিয়ে এসেছে। দীপের জন্য অনেকগুলো ইনহেলার এনেছে সে, দীপের ইনহেলার প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

আবীরের জন্য টেস্টানোন ২৫০-ও খুজেছিল সে, কিন্তু যেই দোকানে সে খুজেছিল সেখানে ছিল না।

গতরাতে এখানে আসার পর আবীর আর দীপের সঙ্গে তার অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। তার মুখ থেকে আবীর আর দীপ শুনেছে তার পুরো ইতিহাস। সে ছিল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। যদিও তার ঝোক ছিল চারুকলার প্রতি, কিন্তু বাবা-মায়ের ইচ্ছার কাছে হার মেনে সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বাধ্য হয়। পড়াশোনার চাপ, ছবি আঁকা ছেড়ে দেয়ার হতাশা, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল, আত্মীয় স্বজনের সমালোচনা- সব মিলিয়ে তার জীবন যখন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল, তখন সে নেশা করতে শুরু করে। ব্যাপারটা বাসায় জানাজানি হয়ে গেলে তার বন্ধুবান্ধবের সাথে সাথে তার পরিবারও তার পাশে থেকে সরে দাড়ায়। তার বাবা মা তাকে বাড়ি থেকে বরে করে দেয়। তারপর দেখতে দেখতে দেড়টা বছর পাড় হয়ে গেছে! এরিকের পুরো ঘটনা শোনার পর আবীর তাকে কথা দিয়েছে, দেশের অবস্থা আবার আগের মত হয়ে গেলে সে তাকে তার পরিবার ফিরিয়ে দেবে। আবীরের কথা শুনে এরিক কয়েক মুহুর্ত চুপ করে ছিল, তারপর সেও কথা দিল, তার বাবা মা যদি তাকে কাছে টেনে নেয়, তাহলে সে সব ধরনের নেশাদ্রব্য ছেড়ে দিয়ে আবার আগের মত হয়ে যাবে।
“কী দেখছ অমন অবাক হয়ে?”

সাইফ স্যারের কণ্ঠ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো আবীর। সাইফ স্যার চারদিকে চোখ বুলাতে বুলাতে সিড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, সবাইকে একমনে কাজ করতে দেখে তিনিও খানিকটা বিস্মিত।
“দেখছিলাম,” আবীর বলল বিস্ময়ের সাথে, “এরা কীভাবে মন লাগিয়ে কাজ করছে!”
“হ্যা, এদের সবার কর্মস্পৃহা দেখে আমিও অবাক!” মাথা নেড়ে বললেন সাইফ স্যার, “আসলে কী জানো তো, প্রতিটা মানুষই তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বাধীনতাকামী। যখনই কউ তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে, তখন সে তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যেকোন কিছু করতে পারে।”

কয়েক মুহূর্তের জন্যে থামলেন সাইফ স্যার, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, “যেমন ধরো, তোমাদের বাবা মায়েরা কিংবা বড় ভাইবোনেরা যখন তোমাদের শাসন করেন, তখন তোমরা কিছুটা বিরক্ত হলেও একটা সময়ে মেনে নাও। কিন্তু সম্পূর্ণ বাইরের একটা লোক যখন তোমাদেরকে শাসন করার চেষ্টা করবে, তোমাদের বিষয়ে অনধিকার চর্চা করবে, তখন কিন্তু সেটা আর শাসনের পর্যায়ে থাকবে না। বরং তখন সেটা শোষণের রূপ নিতে শুরু করবে। তখন তোমরা স্বাভাবিকভাবেই সেই শোষণ থেকে মুক্তি চাইবে।”

সাইফ স্যারের কথা বুঝতে পেরে তিনজনই গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। তারপর আবার সামনের দিকে তাকিয়ে সবার কাজ দেখতে লাগল তারা। রায়হানের মুখে বিজয়ের হাসি, কারণ এতক্ষণ ধরে যেই স্টোভটা সে ঠিক করার চেষ্টা করছিল সেটা এখন রান্না বসানোর জন্য প্রস্তুত। কয়েকজন মহিলা, যাদের পতিতালয় থেকে আনা হয়েছিল, চালের বস্তা টানাটানি করছে রান্না বসানোর জন্য। এমনিতে শুধু ডাল-ভাত খুবই খুবই নীরস খাবার, কিন্তু আজ সেই ডাল আর ভাত রান্নার প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছে যেন পোলাও কোরমা রান্না হচ্ছে!

খালার সামনে দুই ড্রাম ভর্তি মানুষের থুতু। প্রথম দফায় সবার থুতু ফেলা শেষ, খাওয়া দাওয়া শেষ করে এসে সবাই আবার থুতু ফেলা শুরু করবে। একসাথে এত মানুষের থুতু আবীর আগে কখনো দেখে নি। আটচল্লিশজন মানুষের প্রত্যেকে মাত্র একদলা করে থুতু ফেলে দু’টো ড্রাম ভরে ফেলতে পারে, এরকম চিন্তা আগে কখনোই তার মাথায় আসে নি।

সবার কাজে বাধা পড়ল, যখন ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকলো রাশেদ। দরজা বন্ধ করে দিতেও ভুলে গেল সে, জোনাকি গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল। রাশেদের চোখে মুখে এক রাশ আতঙ্ক, তার চোখ দু’টো দেখে মনে হচ্ছে

যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে! সাইফ স্যারের সামনে এসে হাসফাস করতে করতে সে বলল, “স্যার! সর্বনাশ হইয়া গ্যাছে স্যার!”

সবাই কাজ ফেলে এগিয়ে এল রাশেদ কী বলে তা শুনতে। সবার চোখেই কৌতুহল। রাশেদ বলল, “অরা শহরের আশেপাশের সব বস্তিতে বস্তিতে যাইয়া আগুন লাগাইয়া দিতাছে! আমি একটা বস্তিতে গেছিলাম, অইখানে কয়ডা মানুষ ছিল। অইখানেও আগুন লাগায় দিছে শয়তানের বাচ্চারা! মানুষগুলা সব পুইড়া মরল, আমি কোন রকমে পালাইয়া আইছি!”

সবার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ পড়ল, একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল সবাই। সাইফ স্যার তার দুই হাত আড়া-আড়িভাবে বুকের ওপর রেখে স্থির হয়ে দাড়িয়ে রইলেন, মুখে কোন কথা বললেন না। তার কপালে দুশ্চিন্তার ভাজ।

“স্যার,” ভয়ে তোতলাতে তোতলাতে দীপ বলল, “ও-ওরা তো এখানে আ-আসবে না, তাই না?”

“আসতেই পারে।” গম্ভীর গলায় সাইফ স্যার বললেন, “যেকোন সময় ওরা এখানেও চলে আসতে পারে। তাই আমাদের যা করার দ্রুত করতে হবে। এখন আমাদের প্রতিটা সেকেন্ডই খুব মূল্যবান!”

১৬.

"চমৎকার কাজ করেছ হে সোলায়মান মোল্লা!" হুইস্কির গ্লাসে একবার চুমুক দিয়ে মুচকি হেসে বলল ফাইজান খান। "চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শহরের চব্বিশ শ' লোকের লাশ ফেলে দিলে! এখন আর কোন সুস্থ মানুষ যদি থেকেও থাকে, তবু তারা ভুলেও আমাদের বিরুদ্ধে দাড়াবার সাহস করবে না!"

সোলায়মান মোল্লার মুখে বিজয়ের হাসি। এই প্রথম সে তার কাজের মাধ্যমে ফাইজান খানকে খুশি করতে পেরেছে। খুশি হয়ে ফাইজান খান নিশ্চয়ই তাকে আরও বড় কোন দায়িত্বে নিয়োগ করবে!

কিন্তু ফাইজান খানের মুখে খুশির ভাব বেশিক্ষণ থাকল না, মুহুর্তেই তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তার হাতে ধরা হুইস্কির গ্লাসে আরেকবার চুমুক দিল সে, তারপর বলল, "কিন্তু ঢাকার বাইরে আমাদের এক্টিভিটি জোরদার হচ্ছে না। শুধুমাত্র ঢাকায় মানুষ মেরে অন্যান্য জায়গায় আমাদের মারার জন্যে মানুষ বাচিয়ে রেখে লাভ কী? প্রতিটা জেলায়ই দ্রুত একশান নেয়া দরকার!"

"এই সোলায়মান মোল্লা থাকতে আপনের কুনো ট্যানশন নাই স্যার!" দাঁত কেলিয়ে হাসতে হাসতে সোলায়মান মোল্লা বলল, "আমি কথা দিতাছি, বাংলাদেশে আমাগো খেলাফ যাওনের মত একটা মানুষও রাখুম না!"

"সোলায়মান," কঠিন গলায় বলল ফাইজান খান, "এক কথা তোমাকে কতবার মনে করিয়ে দিতে হবে?"

নিজের ভুল বুঝতে পেরে জিভে কামড় দিল সোলায়মান মোল্লা। তারপর দু'হাতে দু'কান ধরে বলল, "ভুল হইয়া গ্যাছে স্যার! বাংলাদেশ না, বাংলাস্তান।"

"প্রফেসর?" ভ্রু কুচকে প্রফেসর রাজ্জাকের দিকে তাকালো ফাইজান খান।

প্রফেসর রাজ্জাক টেবিলের পূর্বপাশের চেয়ারটিতে বসে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ফাইজান খান আর সোলায়মান মোল্লার মধ্যে কী নিয়ে কথা হচ্ছে তার কিছুই তিনি শুনতে পান নি, আনমনে অন্য কিছু ভাবছিলেন। ফাইজান খানের ডাকে তার সম্বিৎ ফিরে এলো। জানালার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে একটু নড়ে চড়ে বসলেন তিনি।
"ওহ হ্যা! বলুন ফাইজান খান।"

কয়েক মুহুর্ত প্রফেসর রাজ্জাকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ফাইজান খান, তার কিঞ্চিৎ কোঁচকানো ভ্রু আরও বেশি কুচকে গেল। তারপর বলল, "তুমি ঠিক আছো তো প্রফেসর? কয়েকদিন যাবৎ তোমাকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।"
"আমি ঠিক আছি।" ম্লান হেসে বললেন প্রফেসর রাজ্জাক। "কিন্তু একটা বিষয় আমাকে খুব ভাবাচ্ছে।"
একটু নড়ে চড়ে বসলো ফাইজান খান। তারপর বলল, "কী বিষয়?"
"আপনি এতটা নিশ্চিত কী করে হচ্ছেন যে আমাদের এই সাড়াশি অভিযানের পর আর কোন সুস্থ মানুষ জীবিত থাকবে না? আশা করি আপনি ভুলে যাচ্ছেন না বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?"
"আমি কিছুই ভুলে যাই নি প্রফেসর।" একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে বলল ফাইজান খান।

প্রফেসর রাজ্জাক এবারে একটু জোর দিয়েই বললেন, "তাহলে আপনি কীভাবে ধরে নিচ্ছেন যে এত সহজেই এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারব মাত্র কয়েকটা অভিযান চালিয়েই?"

"আমি সেরকম কিছু ধরে নিয়ে এই অভিযান চালাচ্ছি না।" চুরুটে বড় একটা টান দিয়ে ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে ফাইজান খান বলল, "আমাদের চালানো এই অভিযান বেঁচে যাওয়া বাঙ্গালগুলোর মনে ভয়ের জন্ম দেবে। তারা যতদিন বেঁচে থাকবে,

আমাদের ভয়ে সিটিয়ে থাকবে! পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে, নয়ত আত্মহত্যা করবে; তবু আমাদের বিরুদ্ধে মাথা তোলার দুঃসাহস কখনোই করবে না!”

কথা শেষ করেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ফাইজান খান। ফাইজান খানের কথার কতটুকু সোলায়মান মোল্লার মাথায় ঢুকলো কে জানে, সেও দাঁত কেলিয়ে হাসতে শুরু করল; হয়ত ফাইজান খানকে খুশি করতেই তার কথায় সায় জানিয়ে সোলায়মান মোল্লার এই বোকার মত হাসি। হাসির ছিটেফোটা নেই কেবল প্রফেসর রাজ্জাকের মুখে।

প্রফেসর রাজ্জাক তার মুখে আগের চাইতে আরও বেশি গাম্ভীর্য টেনে এনে বললেন, “কেউ-ই যদি সেই দুঃসাহস না করে তাহলে ভালো। কিন্তু মি. ফাইজান খান, একজনও যদি ক্ষেপে উঠে সেই দুঃসাহস দেখিয়ে বসে, তাহলে কিন্তু সেই একজনের কারণেই ওলট পূরাণ হয়ে যেতে পারে!”

হাসি থেমে গেল ফাইজান খানের। তার দেখাদেখি সোলায়মান মোল্লাও হাসি থামিয়ে দিল। সোলায়মান মোল্লা অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, ফাইজান খানের কপালে একটু একটু করে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। সে কিছুতেই বুঝতে পারল না, প্রফেসর কী এমন বললেন যার কারণে ফাইজান খান গভীর দুশ্চিন্তার সাগরে ডুবে গেল?

১৭.

ডক্টর সাইফ রাজুর ঘরে গোল টেবিলটাকে ঘিরে বসে আছে তিনজন- দীপ, আবীর আর জোনাকি। টেবিলের ওপর চারটি বড় বড় টিউব রাখা। টিউবগুলো ভর্তি ফেনা ফেনা থুতু। ঘরের এক কোণে বড় বড় অনেকগুলো পিচকারি দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাড় করিয়ে রাখা আছে। এই পিচকারিগুলো বাচ্চাদের খেলনা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এখন এগুলো ব্যবহৃত হবে অস্ত্র হিসেবে। তার পাশেই আছে শ'খানেক স্মোক বোম্ব। আজ রাতের মধ্যেই আরও অনেকগুলো স্মোক বোম্ব তৈরি করতে হবে!

আজ সারাদিন সবাই অনেক পরিশ্রম করেছে, অনেক ধকল গেছে সবার ওপর দিয়ে। তাই সাইফ স্যার সবাইকে আধঘণ্টার জন্য বিশ্রাম নিতে বলেছেন। সাইফ স্যার আবীর, দীপ আর জোনাকিকে থুতু ভর্তি এই চারটি টিউব ধরিয়ে দিয়ে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন তার জন্যে অপেক্ষা করতে। সাইফ স্যার নিচে এরিক আর রায়হানকে কিছু কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

"কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি, আমাদের মুখের থুতু এত বড় কাজে লাগতে পারে!" টিউবগুলোর দিকে তাকিয়ে দীপ বিড় বিড় করে বলল।

জোনাকি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই একটা সাদা রুমাল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন সাইফ স্যার। টেবিলের কাছে এসে একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে সেটায় বসলেন তিনি। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন তিনি, বোঝা গেল তিনি তাদের তিনজনের উদ্দেশ্যে কিছু বলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

"তারপর?" পালাক্রমে তিনজনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ডক্টর সাইফ রাজু বললেন, "কীভাবে কী করবে, কিছু ভেবেছ?"

পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল তারা তিনজন। ভেবেছে তো তারা অনেক কিছুই, কিন্তু কোন রকম কূল কিনারা এখনও পর্যন্ত করতে পারে নি। যতবারই তারা কিছু ভাবার চেষ্টা করেছে সবকিছুই তালগোল পাকিয়ে গেছে! একদিকের সমস্যা যখন খানিকটা সমাধান হয়ে আসে, তখন অন্য দিকে নতুন করে কিছু একটা সমস্যা দাড়িয়ে যায়।

প্রথম মুখ খুলল আবীর। সে বলল, "স্যার, আমরা যতই ভাবছি, ততই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সবকিছু! চিন্তা তো মূলত ঐ চারটা ডিভাইস থেকে ভাইরাস ভর্তি টিউব সরিয়ে সেখানে আমাদের থুতু ভর্তি এই টিউবগুলো বসিয়ে দেয়া নিয়ে। কিন্তু ডিভাইসগুলো তো আর কোন খোলা জায়গায় এমনি এমনি রেখে দেয়ার কথা না, যথেষ্ট কড়া পাহাড়ার মধ্যেই রাখার কথা!"

"আর যদি আমরা সেই পাহাড়া ডিঙিয়ে ডিভাইসগুলোর কাছে পৌছেও যাই," একবার আবীরের দিকে আর একবার সাইফ স্যারের দিকে তাকিয়ে জোনাকি বলল, "তারপরেও আরও একটা ঝামেলা তো রয়েই যাচ্ছে। ওখানে তো অবশ্যই সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে। পাহাড়া ডিঙিয়ে আমরা ওখানে যেতে যেতে ওদের কন্ট্রোলরুমে খবর পৌছে যাবে। আমরাও ধরা পড়ে যাব, আমাদের এত পরিশ্রমও সব ভেস্তে যাবে!"

এবারে একটু নড়ে চড়ে বসলেন ড. সাইফ রাজু। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "তোমরা যা যা বললে, সেগুলো সমস্যা বটে। কিন্তু তার চাইতেও বড় একটা সমস্যা যে এখনও রয়ে গেছ। সে ব্যাপারে কি কিছু ভেবেছ?"
তিনজনই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো ড. সাইফ রাজুর দিকে। কোন সমস্যার কথা বলছেন তিনি, যার কথা তারা এত দিনেও ভাবে নি?
"তোমরা কি জানো," সাইফ রাজু আগের মতই আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, "ডিভাইসগুলো কোথায় রাখা আছে?"

থতমত খেয়ে গেল তারা তিনজনই। এই ব্যাপারটা নিয়ে তারা একটি বারের জন্যেও ভাবে নি! অথচ এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। ডিভাইসগুলো খুজে না পেলে তাদের সমস্ত পরিশ্রম মাটি হয়ে যাবে!

"আমরা এখনও পর্যন্ত এটাই জানি না যে ডিভাইসগুলো কোথায়!" হতাশ গলায় বললেন সাইফ স্যার, "আমি রায়হান, মকবুল আর ইভানকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম ডিভাইসগুলোর লোকেশন খুজে বের করার জন্য। ওদের কাছে ঐ ডিভাইসের ছবি দিয়ে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোজ করতে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু টানা দু'দিন ধরে খুজেও তারা কোন হদিস পায় নি।"

দীপ জিজ্ঞেস করল, "এটা তো শিওর যে ডিভাইসগুলো যেই চারটা পয়েন্টে আছে, সেই চারটা পয়েন্ট ঢাকা শহরের মধ্যেই?"

"হ্যা," সাইফ স্যার বললেন, "কিন্তু এত বড় শহরে চারটা পয়েন্ট খুজে বার করা নদীর মধ্যে সুই খোজার মতই ব্যাপার!"

"যেহেতু বিস্ফোরণের মাধ্যমে ওরা ভাইরাসটাকে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়, তারমানে ডিভাইসগুলো অবশ্যই কোন উচু জায়গায় থাকবে।" ঠোটে চিমটি কাটতে কাটতে জোনাকি বলল, "যেমন- উচু কোন টাওয়ার।"

সাইফ স্যার জোনাকির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের কি মনে হয়, ওদের আমি সেসব জায়গায় খোজ করতে বলি নি? খুজতে খুজতে মকবুল আর ইভানের ক্লান্ত হয়ে সেন্সলেস হওয়ার অবস্থা হয়েছে! রায়হান ঐ দুইজনকে টানতে টানতে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। এখন দ্বিতীয় দফায় খোজার জন্য রায়হানের সঙ্গে এরিককে পাঠালাম। দেখা যাক কী হয়!"

"আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?"

একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল দরজার বাইরে থেকে। চমকে উঠল তারা চারজন। একসঙ্গে চার জোড়া চোখ ঘুরে গেল দরজার দিকে। দরজায় যে লোকটি দাড়িয়ে আছেন, তাকে দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না তারা কেউ-ই। প্রচণ্ড বিস্ময়ে চারজনেরই চোয়াল ঝুলে পড়ল। বিস্ফারিত চোখে তারা দেখল, দরজায় দাড়ানো লোকটি তার ঠোটে এক টুকরো ম্লান হাসি ঝুলিয়ে রেখে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছেন তাদের দিকে।

১৮.

-মাস্টার ক্রুগো!

-বলো মীরা।

-আপনি দেখেছেন ফাইজান খান কী করছে?

-আমি সবই দেখেছি মীরা। আমি শুধু দেখতে চাচ্ছিলাম ফাইজান খানের নির্বুদ্ধিতার সীমা কতটুকু! সে যে এতটা নির্বোধ হতে পারে, সে ব্যাপারে আমার ধারনাও ছিল না।

-ফাইজান খান তো তার নির্বুদ্ধিতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে মাস্টার ক্রুগো! তাকে বলা হয়েছিল সব সুস্থ মানুষগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। কিন্তু তাই বলে এভাবে?

-তাকে বাংলাদেশের দায়িত্ব দেয়াটা আমার মস্ত বড় ভুল সিদ্ধান্ত ছিল।

-বাকি তেরোটা দেশে আমাদের লোকেরা এরই মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলেছে, ঐসব দেশ এখন পুরোপুরি আমাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু ঐ মাথামোটা ফাইজান খান বাংলাদেশে যা শুরু করেছে, তাতে আমাদের পুরো প্রজেক্ট পাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে!

-মীরা।

-আদেশ করুন মাস্টার ক্রুগো।

-ফাইজান খানকে কানেক্ট করো। আমি ওর সাথে কথা বলতে চাই।

****

-ফাইজান খান।

-মাস্টার ক্রুগো! আমি ধন্য আপনার দেখা পেয়ে! বলুন আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?

-চুপ থাকো গর্দভ কোথাকার!

- আ-আমার দ্বারা কি ক্ব-কোন ভুল হয়ে গেছে ম্-ম্-মাস্টার ক্রুগো?

-ভুল তোমার হয় নি, ভুল হয়েছে আমার! তোমাকে বাংলাদেশের দায়িত্ব দেয়াটাই ছিল আমার সবচাইতে বড় ভুল। তোমার বোকামীর কারণে আজ আমাদের প্রজেক্ট পাই ভণ্ডুল হতে বসেছে!

- কেন ম্-ম্-মাস্টার ক্ব-ক্রুগো? আ-আমি এমন কী করেছি?

-তোমাকে সব সুস্থ মানুষ নিশ্চিহ্ন করতে কেন বলা হয়েছিল? যাতে তারা কখনো আমাদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। অথচ তুমি যেভাবে মানুষ মারতে শুরু করেছ, তাতে পুরো পৃথিবী জানাজানি হতে বেশি সময় লাগবে না। তখন দেখা যাবে শুধু বাঙালিরা না, গোটা পৃথিবী-ই আমাদের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে যাবে!

-তাহলে এ-এখন কী করব মাস্টার ক্রুগো?

-তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না! তুমি শুধু খোজ লাগাও, কোথায় কোথায় সুস্থ মানুষ আছে। তারপর অপেক্ষায় থাকো আমার পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত।

১৯.

"সবাই রেডী?" দলের সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন ড. সাইফ রাজু। তার দলে মোট বিশজন সদস্য, তাদের মাঝে ছয়জন মহিলা। বিশজনের এই দলটা ড. সাইফ রাজুর সঙ্গে যাচ্ছে মতিঝিলে।
বিশজন একসঙ্গে বলল, "আমরা সবাই রেডী স্যার।"
সাইফ স্যার আবার বলতে শুরু করলেন, "এখনও যদি কারো কোথাও কিছু বুঝতে সমস্যা থেকে থাকে তাহলে প্রশ্ন করতে পারো।"

বিশজন কিছুক্ষণ ফিসফিস করে নিজেদের মাঝে আলোচনা করল, ছোটখাট তর্ক বিতর্কও হল নিজেদের মাঝে। এরপর এক পর্যায়ে সবাই একসঙ্গে সাইফ স্যারের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে জানালো, তারা পুরো প্ল্যানটা ভালো করে বুঝে নিয়েছে।

তারপরেও প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার করে তাকালেন সাইফ স্যার, এটা নিশ্চিত হবার জন্যে যে সবাই আসলেই সবকিছু বুঝতে পেরেছে কিনা। কারো চেহারায় কোন রকম বিভ্রান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। বরং সবার চেহারাতেই এক ধরনের দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে!

অন্যদিকে ঘরের একপাশে জোনাকিকে ঘিরে আছে সাতজন- মকবুল, মাজহার, ফরহাদ, মতি, ইভান, ফারজানা আর জয়নব। চারটি দল যাবে চারটি ডিভাইসের কাছে, প্রতিটি দলে দুইজন করে থাকবে। একজন পাহারারত ভাইরাস আক্রান্তদের ঠেকাবে, আর অন্যজন ডিভাইসটাতে বসানো ভাইরাস ভর্তি টিউব বদলে সেখানে তাদের থুতু ভর্তি টিউব বসিয়ে দেবে। চারটি দলের একটিতে থাকবে জোনাকি আর ইভান। জোনাকি এখন বাকিদের নিয়ে বসে একটা সাদা কাগজে ডিভাইসটার ছবি

এঁকে সেটার সমস্ত খুটিনাটি তাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, যা গতকাল রাতে সাইফ স্যার তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।
“জোনাকি আপা, একটা জিনিস আমি বুঝতে পারতেছি না।” ড্রাগ এ্যাডিক্টেড যারা, তারা গত তিন দিনে প্রচণ্ড কাজের চাপে একবারের জন্যেও নেশা করার সুযোগ পায় নি; কিন্তু ইভানের কণ্ঠ শুনে মনে হল সে বুঝি এইমাত্র মদ খেয়ে এসেছে!
“কী?” ইভানের মাতাল মাতাল কণ্ঠ শুনে কিছুটা বিরক্ত হল জোনাকি।
ইভান মাথা চুলকে বলল, “দুইটা দিন আমরা সারা শহরে খুজেও পাইলাম না এই জিনিসগুলা কই রাখা আছে! আর আপনারা না খুজতেই কেমনে জানলেন যে এইগুলা ঐখানেই আছে?!”

বাকিরা কিছু না বললেও তাদের চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে যে তাদের মনেও একই প্রশ্ন। কিন্তু তাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার এবং তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর মত সময় এখন নেই। তাই জোনাকি সবার উদ্দেশ্যেই বলল, “এখন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় না, আর এটা এখন গুরুত্বপূর্ণও না। আমাদের আজকের এই অপারেশান সফল হলে ফিরে এসে আমরা শুধু এই বিষয়েই না, আরও অনেক বিষয় নিয়েই জমিয়ে আড্ডা দেব। কিন্তু এখন শুধুমাত্র কাজ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করারও সময় নেই!”

জোনাকির কথায় সবাই সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। তারপর সবাই আবার জোনাকির হাতে ধরা ছবিটায় মনোযোগ দিলো। এখন তো তারা কেবল ছবিতে দেখছে, আর অল্প কিছুক্ষণের মাঝেই তাদেরকে এই বিদঘুটে দেখতে যন্ত্রটা নিয়ে নাড়া চাড়া করতে হবে!

ঘরের আরেক পাশে ছয়জনের একটা জটলা, সেখানে আছে- আসিফ, এরিক, হাসান, নাহিয়ান, দীপ এবং আবীর। আবীর বাকি পাঁচজনকে নিয়ে যাচ্ছে তার কলেজে, যেখানে কিনা এখন ফাইজান খানের আস্তানা। এরই মধ্যে তাদের পরিকল্পনার প্রথম

অংশে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে, যার কারণে তাদের অপারেশান অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে। পরিকল্পনার প্রথম অংশটি ছিল এরকম- ছয়জনের এই দলটি ফাইজান খানের ডেরায় পৌছে সেখানকার গার্ডদের একে একে ক্লোরোফর্ম শুকিয়ে অজ্ঞান করে ফেলবে, তারপর তাদের হাত থেকে একে একে তাদের অস্ত্রগুলো নিয়ে নেবে। এরপরে তারা ছয়জন কলেজ বিল্ডিং-এর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

কিন্তু এখন আর সেটা করার প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের ছয়জনের জন্যে তারা পেয়ে গেছে ছয়টি রিভলবার! নাহিয়ানের কাছে একটা রিভলবার আগে থেকেই ছিল, কারণ পেশায় সে একজন ভাড়াটে সন্ত্রাসী। তার নিজের রিভলবার ছাড়াও আরও পাঁচটা রিভলবার সে যে কোথা থেকে নিয়ে এসেছে, তা সে-ই জানে!

ঘরের মাঝখানে এসে দাড়ালেন ড. সাইফ রাজু। তারপর গলা খাকারি দিয়ে বললেন, “আশা করি আমাদের প্ল্যান নিয়ে কারো আর কোন কনফিউশন নেই। আছে কি?”
আবীর আর জোনাকি নিজ নিজ দলের সবার দিকে তাকালো সাইফ স্যারের প্রশ্নের উত্তরের আশায়। সবাই একই ভাবে মাথা দোলালো, মুখে কোন কথা বলল না।
“গুড।” সন্তুষ্টি ঝড়ে পড়ল সাইফ স্যারের কণ্ঠে, “তাহলে সবাই নিজেদের ঘড়ির সময় মিলিয়ে নাও। এক সেকেন্ডেরও যেন গরমিল না থাকে!”

সবাই যার যার হাতের হাতঘড়ির দিকে তাকালো, ঘড়ির সময় সবাই সবার সাথে মিলিয়ে নিলো। এই হাতঘড়িগুলোও রাশেদ, মকবুল আর হাসান বসুন্ধরা সিটি থেকে চুরি করে এনেছে। সাইফ স্যার আটচল্লিশজনের জন্য আটচল্লিশটা হাতঘড়ি আনতে বলেছিলেন। কিন্তু একসাথে এতগুলো ঘড়ি সামনে পেয়ে তারা এই অবস্থার মধ্যেও লোভ সামলাতে পারে নি! তিনজন তিনটা বস্তা বোঝাই করে যতগুলো হাতঘড়ি এনেছে, তা সারাদিন বসে বসে গুণলেও গুণে শেষ করা যাবে না!

এক রাশ গাম্ভীর্য এসে ভর করল ড. সাইফ রাজুর চেহারায়। গম্ভীর মুখে তিনি বললেন, “আজই হবে শেষ বিচার! এরপর হয় আমরা থাকব, নয়ত ঐ ফাইজান খান!”

২০.

“অমন করে কী দেখছো হে সোলায়মান?” মুচকি হেসে সোলায়মান মোল্লাকে জিজ্ঞেস করল ফাইজান খান।

মাথা চুলকাতে চুলকাতে সোলায়মান মোল্লা বলল, “কিছুই তো বুঝতাছি না স্যার। এত্তগুলান চাক্কা, লগে আবার পাঙ্খা লাগানো; এইগুলা আবার কী জিনিস?!”
সোলায়মান মোল্লার কথা শুনে হাসলো ফাইজান খান, বলল, “বাপের জন্মেও ড্রোন দেখ নি তো? মনের সাধ মিটিয়ে দেখে নাও এবার।”

সোলায়মান মোল্লা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সামনে রাখা ড্রোনগুলোর দিকে। সে ড্রোন চেনে না এমন নয়, ড্রোন সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান তার আছে। কিন্তু ড্রোন জিনিসটা সে আগে কখনও দেখে নি। দেখার প্রয়োজনও পড়ে নি অবশ্য। হুকুমের গোলাম সে, ওপর থেকে হুকুম আসা মাত্রই সে “আল্লাহু আকবার” বলে “বিধর্মী”দের কতল করতে ঝাপিয়ে পড়ে। হুকুম তামিলের জন্য যতটুকু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তার জ্ঞান ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সীমা লঙ্ঘন করে প্রয়োজনের বেশি জ্ঞান সোলায়মান মোল্লাদের রাখতে নেই। এতে নেকী কমে যায়। এই শিক্ষা সোলায়মান মোল্লা পেয়ে এসেছে সেই ছোটবেলা থেকেই, যখন সে মাদরাসায় পড়ত।

“প্রফেসর,” প্রফেসর রাজ্জাকের দিকে তাকিয়ে ফাইজান খান বলল, “আমাদের শান্তির পায়রাগুলো প্রস্তুত তো শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে?”
ফাইজান খানের কথা শুনে একগাল হেসে প্রফেসর রাজ্জাক বললেন, “একদম!”

উচ্ছ্বসিত হয়ে ফাইজান খান বলল, "চমৎকার! তাহলে আর দেরি কেন? শান্তির পায়রাগুলোকে উড়িয়ে দাও, তারা শান্তি ছড়াক! শান্তির জন্যে আমার যে আর তর সইছে না!"

ফাইজান খান আজ বেজায় খুশি, যদিও গোলাগুলি, জ্বালাও পোড়াও ছেড়ে "BIO WAR"-এর দিকে যাওয়াটা তার কাছে খানিকটা নিরামিষই ঠেকছে। তার ইচ্ছা ছিল বাঙালিগুলোকে ধরে ধরে আগুনে পুড়িয়ে মারা! সেই তুলনায় এভাবে বায়ুবাহিত জীবাণু ছড়িয়ে দিয়ে চুপচাপ মানুষগুলোকে মেরে ফেলার ব্যাপারটা একেবারেই নিরামিষ!

কিন্তু তারপরেও ব্যাপারটা মন্দ না। মোট ৬০ টা ড্রোন, সারাদেশে টহল দিয়ে বেড়াবে। যেসব এলাকার বাতাসে এফিব্যান ভাইরাসের ঘনত্ব কম দেখা যাবে, সেখানেই ড্রোনগুলো ছড়িয়ে দেবে বায়ুবাহিত জীবাণু, যা সেখানকার মানুষের নিঃশ্বাসের সাথে তাদের দেহের ভেতরে প্রবেশ করবে। ড্রোনগুলোকে এমনভাবেই প্রোগ্রামিং করা হয়েছে। এর পেছনে কারণ অবশ্য দু'টো। প্রথমত, যেসব এলাকায় সুস্থ মানুষের সংখ্যা বেশি, সেসব এলাকায় তাদের স্বাভাবিক কার্যকলাপের কারণে বাতাসে ভাইরাসের ঘনত্ব একটু একটু করে কমে আসবে। তাই কোন জায়গায় ভাইরাসের ঘনত্ব কম থাকার অর্থ হচ্ছে সেখানে সুস্থ মানুষ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, যেসব এলাকায় ভাইরাসের ঘনত্ব কম, সেসব এলাকায় ভাইরাস আক্রান্তদেরও আনাগোনা থাকবে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই সুস্থ মানুষেরা ভাইরাস আক্রান্তদের হাত থেকে বাঁচতে সেখানেই গিয়ে আস্তানা করবে।

ড্রোনগুলো যে জীবাণু বোঝাই সিলিন্ডার বহন করছে, সেই জীবাণু আক্রমণের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তার কাজ শুরু করে দেবে। আর ফলাফল বেরিয়ে আসবে তার দু'দিনের মধ্যেই। দু'দিনের মধ্যে আক্রান্তদের নাক মুখ আর সারা শরীরের লোমকূপ

দিয়ে রক্তপাত শুরু হবে, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পচন ধরতে থাকবে! এরপর অবধারিত পরিণতি মৃত্যু।

বাঙালিগুলোকে চোখের সামনে এভাবে ধুকে ধুকে মরতে দেখতে পাবে, ব্যাপারটা ভেবেই খুশিতে তিনটা ডিগবাজি দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে ফাইজান খানের। শত্রুকে গুলি করে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে মারার চাইতে এভাবে মরতে দেখা যে আরও অনেক বেশি আনন্দের!

২১.

কোমরে গোজা রিভলভারটাতে একবার হাত বোলালো আবীর। সঙ্গে সঙ্গে একটা শিহরণ বয়ে গেল তার সারা শরীরে। সে কখনও স্বপ্নেও ভাবে নি, এভাবে একটা রিভলভার কোমরে গুজে, পকেটে ক্লোরোফর্মের শিশি, রুমাল আর একটা নাইফ নিয়ে সে দলবল সহ কোথাও আক্রমণ করতে বেরিয়ে পড়বে।

বের হওয়ার আগে আবীর আর তার দলের সবাই নাহিয়ানের কাছ থেকে রিভলভার চালানো শিখে নিয়েছে। যদিও তাদের মধ্যে হাসান আগে থেকেই রিভলভার চালাতে জানে। দলের বাকিদের কাছেও একটা করে রিভলভার, ক্লোরোফর্মের শিশি, রুমাল আর নাইফ দিয়ে দেয়া হয়েছে।

কলেজের পশ্চিম দিকের পাঁচিলের কাছে এসে দাড়ালো আবীর। দু'হাত উচু করে লাফ দিয়ে পাঁচিলের ওপরের অংশটা খামচে ধরল, তারপর পাঁচিলের গায়ে দুই পা ঠেকিয়ে দু'হাতে ভর করে দেহের ওপরের অংশ তুলে দিলো পাঁচিলের ওপরে। এরপর বুকের ওপর ভর দিয়ে দুই পা ঝুলিয়ে দিলো পাঁচিলের অন্য পাশে। দু'হাতের থাবা দিয়ে পাঁচিলের ওপরের অংশ ধরে রেখে শরীরের বাকি অংশও ঝুলিয়ে দিলো। আবীর মাটিতে নেমে সারতে পারল না, চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলল প্রায় বিশ-পঁচিশজন কালো পোশাকধারী সশস্ত্র গার্ড। কঠিন স্বরে তারা বলল, “হল্ট!”
আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত ওপরে তুলল আবীর। ধরা পড়ে গেছে সে!

****

“পিচকারিতে ভাইরাসের এ্যান্টিডোট ঠিকমত ভরে নিয়েছ তো?” ইভানকে জিজ্ঞেস করল জোনাকি।

ইভান তার হাতের পিচকারিটা একবার ঝাকি দিয়ে একগাল হেসে বলল, “কোনো ট্যানশন নিয়েন না জোনাকি আপা। আমি পিচকারি একদম গলা পর্যন্ত ভইরা আনছি! চারজন কেন, যদি চল্লিশজনও থাকে, তাও সবাইরে মাখায়া দেওয়া যাইব!”
“শোনো,” জোনাকি বলতে শুরু করল, “আবারও বলছি, তিনটা বেজে ঠিক বিশ মিনিটের সময় আমরা দুইজন দুই দিক দিয়ে টাওয়ারটার ওপরে উঠব। তুমি একদিক দিয়ে উঠেই শিস বাজাবে, যেন ডিভাইসটার পাহারায় থাকা ভাইরাস আক্রান্ত ঐ চারজন তোমাকে দেখতে পায়। তারা তোমাকে দেখতে পাওয়া মাত্রই তোমাকে মারার জন্য তোমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে, তখন তুমি পিচকারি থেকে এ্যান্টিডোট ছুড়ে মারবে ঐ চারজনের দিকে। সেই ফাকে আমি অন্য দিক দিয়ে উঠে গিয়ে ডিভাইসের টিউবটা বদলে সেখানে আমাদের এ্যান্টিডোট ভর্তি টিউবটা রেখে দেব। মনে থাকবে?”
“হু। মনে থাকব।” কাধ নেড়ে বলল ইভান। মনে থাকারই কথা, এখানে আসার পথে জোনাকি অন্তত পাঁচবার পুরো প্ল্যানটা মনে করিয়ে দিয়েছে ইভানকে।

জোনাকি তার হাতে ধরা থুতু ভর্তি টিউবটার দিকে একবার তাকালো, তারপর তাকালো সামনের টাওয়ারটার দিকে। এই টাওয়ারটার ওপরেই আছে সেই ডিভাইস, যে ডিভাইস যেকোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হয়ে বাতাসে আবার এফিব্যান ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে প্রস্তুত; অপেক্ষা শুধুই ফাইজান খানের রিমোট কন্ট্রোলের একটা ইশারার!

ঘড়ি দেখল জোনাকি, তিনটা দশ বাজে। আর মাত্র দশ মিনিট! এই দশ মিনিটের মধ্যেই আবীরের গ্রুপ কন্ট্রোল রুমের দখল নিয়ে সব সিসি ক্যামেরা অকেজো করে

দেবে। আর তারপর ঠিক তিনটা বেজে বিশ মিনিটে জোনাকির গ্রুপের কাজ শুরু হবে। এবং সেটা করতে হবে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে!

এতক্ষণে হয়ত বাকি ছয়জনও অন্য তিনটা ডিভাইসের কাছে পৌছে গেছে, মনে মনে ভাবলো জোনাকি। হয়ত তারাও এখন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সঠিক সময়ের জন্য!

****

লাখ লাখ মানুষ জড়ো হয়েছে শাপলা চত্বরে, চতুর্দিক থেকে এখনও আরো মানুষ আসছে। সবাই বিড় বিড় করে আউড়েই যাচ্ছে- "পাকিস্তান জিন্দাবাদ! পাকিস্তান জিন্দাবাদ!" এই মানুষগুলো জানেও না তারা কী বলছে, তাদেরকে দিয়ে কী বলানো হচ্ছে। এদের ব্রেইন ওয়াশ করে দিয়েছে ভাইরাস এফিব্যান!

হতবাক হয়ে সবকিছু দেখছিলেন ড. সাইফ রাজু। দেশের জন্যে কাজ করার পক্ষে দশজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষকে একসঙ্গে পাওয়া যায় না, অথচ দেশের শত্রুদের পক্ষে দাড়ানোর জন্য আজ সব অসুস্থ মানুষেরা একজোট!

ভাইরাস আক্রান্তদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে থেকেই ময়না জিজ্ঞেস করল, "স্যার, এহন কী করমু?"

ড. সাইফ রাজু ঘড়ি দেখলেন, তিনটা দশ বাজে। তিনি প্রথমে ময়না তারপর বাকিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সবাই ছড়িয়ে পড়ো ভিড়ের মধ্যে। ঘড়িতে যখন ঠিক তিনটা বিশ বাজবে, ঠিক তখনই সবাই যার যার হাতের স্মোক বোম্বগুলো ফাটিয়ে দেবে। স্মোকের মাধ্যমে আমাদের এ্যন্টিডোট চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে দশ সেকেন্ড সময় নেবে। দশ সেকেন্ড পর কিছুটা দূরে গিয়ে আরেকটা ফাটাবে। মনে থাকে যেন, চারটা বোম্ব ফাটানো শেষ না হওয়া অবধি কেউ পিচকারি ব্যবহার করবে

না। পিচকারিগুলোর মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণে এ্যান্টিডোট দেয়া আছে, খুব প্রয়োজন না পড়লে ব্যবহার করা যাবে না।”

সবাই সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। তারপর একে এক সবাই মিশে যেতে শুরু করল ভিড়ের মধ্যে। প্রত্যেকের কাছেই চারটা করে স্মোক বোম্ব আর একটা করে পিচকারি, যার মধ্যে আছে তাদেরই থুতু থেকে তৈরি এ্যান্টিডোট। একটা সময় এই পিচকারি দিয়েই তারা অনেকে হোলি খেলেছে, একে অপরের গায়ে রং ছুড়ে মেরেছে। মজার একটা খেলার জিনিস ছিল এই পিচকারি। কে জানত, এই মজার জিনিসটাকেই একদিন তারা ব্যবহার করবে অস্ত্র হিসেবে, যে অস্ত্রের ভেতরে বুলেটের পরিবর্তে থাকবে তাদের থুতু?

****

“জয় বজরঙ্গবলী!”

কথাটা বলেই কলেজ বিল্ডিং-এর উত্তর পাশের পানির পাইপলাইন বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল দীপ। তার পেছন পেছন উঠে আসতে লাগল আসিফ, এরিক, হাসান আর নাহিয়ান। তাদেরকে এদিকে পাঠিয়ে দিয়ে কলেজের পশ্চিম দিকে চলে গেছে আবীর। কে জানে সে এখন কী করছে!

ছাদের ওপর নেমেই ঘড়ি দেখলো দীপ। তিনটা বেজে দশ মিনিট। তাদের হাতে আর মাত্র দশ মিনিট আছে!

“ভাই, আপনের কি ভয় লাগতেছে?” দীপকে জিজ্ঞেস করল আসিফ।

দীপের প্রচণ্ড ভয় লাগছে, কিন্তু সেটা সে বাকিদের বুঝতে দিতে চায় না। আসিফের দিকে না তাকিয়েই দীপ জবাব দিলো, “না।”

তবুও আসিফ বুঝতে পারল, দীপ ভয় পাচ্ছে। তাই সে আবারও বলল, “ভয় পাইয়েন না দীপ ভাই, আমরা আছি না? দাড়ান, আয়াতুল কুরসী পইড়া আপনারে একটা ফু দিয়া দিতাছি!”

বলেই বিড় বিড় করে আয়াতুল কুরসী পড়তে লাগল আসিফ। আয়াতুল কুরসী পড়া শেষ করে সে দীপের বুকে তিনবার ফু দিয়ে দিলো। তারপর একগাল হেসে বলল, “ফু দিয়া দিছি, আর কোনো ভয় নাই। আর আপনিও আপনাগো হনুমান চলিসা আউড়াইতে থাকেন। দেখবেন, ভয় বাপ বাপ কইরা পালাইব!”

আসিফের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো দীপ। তার ভয় এবার সত্যি সত্যিই কেটে গেছে। আসিফ ড্রাগ এ্যাডিক্টেড হলেও মানুষ হিসেবে ভালো। এমন একজন মানুষ যদি সহযোদ্ধা হিসেবে পাশে থাকে, তাহলে ভয় আপনা আপনিই কেটে যাওয়ার কথা।
“চলো এবার। আর দেরি করা ঠিক হবে না।” তাগাদা দিলো দীপ।

ছাদের সিড়ির দরজাটা খোলাই আছে, সেই দরজা দিয়ে ঢুকে সিড়ি ভেঙে নিচে নামলো তারা। এখন তারা তৃতীয় তলায় আছে। তৃতীয় তলার তিনশ’ চার নং রূমটাই কন্ট্রোল রূম হওয়ার কথা। কিছুদূর এগোতেই থমকে দাড়াতে হল তাদের। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, কেউ এদিকেই আসছে! হাসান আর নাহিয়ান দ্রুত মুখ লুকালো দীপ, এরিক আর আসিফের পেছনে। তাদের তিনজনের চোখে বেগুনী রঙের লেন্স থাকায় তাদেরকে ভাইরাস আক্রান্ত বলেই মনে হবে, কিন্তু বাকি দু’জনের জন্য লেন্স বা মেকআপ কোনোটারই ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। সোজা হয়ে দাড়িয়ে রইলো দীপ, আসিফ আর এরিক।

যার পায়ের শব্দ ভেসে আসছিলো কয়েক সেকেন্ড বাদেই তাকে দেখতে পেল তারা। মধ্যবয়স্ক একটা লোক। তার মুখটা ফ্যাকাসে, চোখ বেগুনী; সেই চোখে প্রাণের

ছিটেফোটাও নেই! লোকটিকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে পাঁচজনেরই বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে গেলো। কিন্তু লোকটা যখন তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল তখন তারা হাফ ছেড়ে বাঁচলো। আবার সামনের দিকে হাটা ধরল তারা।

তিনশ’ চার নং রূমের সামনে দরজার দু’পাশে দু’জন কালো পোশাকধারী গার্ড দাড়িয়ে পাহাড়া দিচ্ছে, তাদের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। হাসান আর নাহিয়ানের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ইশারা করল দীপ। তারা দু’জন বুঝে গেল তাদেরকে কী করতে হবে। পকেট থেকে ক্লোরোফর্মের শিশি আর রুমাল বের করল তারা দু’জন। তারপর রুমালে খানিকটা ক্লোরোফর্ম ঢেলে নিলো। গার্ড দু’জনের দিকে এগিয়ে গেল দীপ, তার পেছন পেছন এগিয়ে গেল আসিফ আর এরিক। দু’জনের সামনে গিয়ে তারা তিনজন। গার্ড দু’জন অবাক হয়ে তাকালো তাদের তিনজনের দিকে তাকালো, এরই মধ্যে যে হাসান আর নাহিয়ান নিঃশব্দে তাদের পেছনে এসে দাড়িয়েছে সেটা তারা টেরও পায় নি। তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাসান আর নাহিয়ান পেছন থেকে তাদের মুখ চেপে ধরল ক্লোরোফর্ম মাখানো রুমাল দিয়ে। বার দুয়েক ছট করেই অচেতন হয়ে গেল তারা দু’জন। ধাক্কা দিয়ে তিনশ’ চার নং রূমের দরজা খুলে ফেলল দীপ। হাসান আর নাহিয়ান অচেতন দুই গার্ডকে ঠেলে দিলো রূমের ভেতরে, ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল গার্ড দু’জন। দরজার বিপরীত দিকের দেয়াল বিশাল আকারের একটা স্ক্রীণ, সেই স্ক্রীণের সামনে বসা দু’জন তড়াক করে উঠে দাড়ালো। একজন কোমড়ে হাত দিতে যাচ্ছিল তার কোমড়ে গোজা রিভলভারটা বের করে আনার জন্য, কিন্তু তার আগেই দীপ তার রিভলভার বের করে তাদের দিকে তাক করে ধরল।

“খবরদার! কেউ এক চুল নড়েছ তো খুলি উড়িয়ে দেব!” রিভলভার তাক করে শাসালো দীপ। তারপর নাহিয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল, “নাহিয়ান, এই দুইজনের হাত মুখ শক্ত করে বেধে ফেলো। আর হাসান, তুমি এই গার্ড দুটোকে বেধে ফেলো।

এদের জ্ঞান ফিরতে পারে যেকোন সময়, তখন যেন কোন রকম ঝামেলা করতে না পারে!”

হাসান আর নাহিয়ান সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। নাহিয়ান কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকা দু’জনের দিকে এগিয়ে গেল। বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে তাদের দু’জনের। এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে তারা কখনও কল্পনাও করে নি!

স্ক্রীণটার দিকে তাকালো দীপ। স্ক্রীণের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জায়গা দেখা যাচ্ছে, যেসব জায়গায় সিসি ক্যামেরা সেট করে রাখা আছে। একটা অংশে দেখা যাচ্ছে এই কলেজের বিভিন্ন জায়গার ফুটেজ, কেবল যেই রাস্তা দিয়ে তারা এ পর্যন্ত এসেছে সেই রাস্তার কোন ফুটেজ নেই।

চারজনেরই হাত পা বাধা হয়ে গেলে হাসান বলল, “দীপ ভাই, এইগুলানরে বান্ধা শেষ!”

দীপ ঘড়ি দেখল, তিনটা বেজে উনিশ মিনিট। আর এক মিনিটের মধ্যেই সাইফ স্যারের টীম আর জোনাকির টীম যে যার জায়গা থেকে কাজ শুরু করে দেবে। কে জানে আবীর এখন কোথায় আছে!

“ঠিক আছে।” দীপ বাকিদের দিকে তাকিয়ে বলল, “এদিকটা আমি দেখছি, আর তোমরা চারজন এখন ছড়িয়ে পড়ো। এখন বাজে তিনটা উনিশ, ঠিক তিনটা বেজে পয়ত্রিশ মিনিট নাগাদ এই পুরো বিল্ডিং আমাদের দখলে থাকবে! ঠিক আছে?”

একসঙ্গে মাথা নাড়ল চারজন, মুখে কিছুই বলল না। দীপ তাড়া দিয়ে বলল, “তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই, বেরিয়ে পড়ো। জয় বাংলা!”

কথাটা বলেই দীপ খেয়াল করল, সে এবারে “জয় বজরঙ্গবলী” বা “জয় হনুমান” বলে নি, বরং নিজের অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে “জয় বাংলা”। কথাটা বলার আগে সে একটিবারের জন্যেও ভাবে যে সে এই কথাটা বলবে। কিন্তু বলার পরে সে বুঝতে পারছে, সে এই কথাটাই বলবে! সে বাঙালি, দুই শব্দের ছোট্ট এই কথাটার সাথে যে তার রক্তের সম্পর্ক!

২২.

কলেজ বিল্ডিং-এর দ্বিতীয় তলার দক্ষিণ দিকের একটা ঘর, যেটাকে আগে স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হত; সেই ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা আয়তাকার টেবিলের একপাশে বসে আছে আবীর, আর অন্যপাশে তিনজন- প্রফেসর জাওয়াদ বিন রাজ্জাক, সোলায়মান মোল্লা আর ফাইজান খান। টেবিলের ওপর রাখা একটা রিভলভার, একটা পকেট নাইফ, একটা ক্লোরোফর্মের শিশি আর একটা রুমাল- যা আবীর তার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

তিনজন-ই একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে আবীরের দিকে, কেউ কোন কথা বলছে না। বেশ অনেকক্ষণ নীরবে কাটলো। তারপর নীরবতা ভাঙলো ফাইজান খান।

"তোমার সাহস দেখে যতটা অবাক হচ্ছি, তার চাইতে বেশি অবাক হচ্ছি তোমার নির্বুদ্ধিতা দেখে!" ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল ফাইজান খান, "আমাদের বিরুদ্ধে নেমে পড়লে শুধুমাত্র একটা রিভলভার আর একটা ক্লোরোফর্মের শিশি নিয়ে? তাও আবার একা?"

আবীর কোনো কথা বলল না, চুপচাপ বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো। ফাইজান খান শীতল গলায় তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী হে ছেলে?"

আবীর এবারেও কোন জবাব দিলো না। তার হয়ে প্রফেসর রাজ্জাক বললেন, "ওর নাম আবীর। ও আমারই ছাত্র।"

"লজ্জা করে না তোমার এ কথা বলতে?!" ধমকে উঠলো ফাইজান খান, "তোমার ছাত্র আজ তোমারই বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়ে নেমে পড়েছে, এটা আবার তুমি বড় মুখ করে বলছ?"

সবাইকে অবাক করে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল আবীর। তার হাসি যেন আর থামতেই চায় না। হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো ফাইজান খান, হিস হিস করে বলল, "তুমি হাসছো কেন?"

হাসি থামিয়ে দিলো আবীর, তারপর প্রথমবারের মত মুখ খুলল, "হাসছি তোমার কথা শুনে ফাইজান খান। আমি রাজ্জাক স্যারের ছাত্র, এটা নিয়ে স্যার আজ গর্ব করতেন যদি না তোমরা তার গর্ব করার ক্ষমতা কেড়ে নিতে!"

ফাইজান খান অবাক হয়ে তাকালো আবীরের দিকে। নিজের চোখ আর কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে! সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে বসেও ছেলেটি হাসছে, আবার তাকে নাম ধরে সম্বোধন করছে!
"তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি ছেলে।" হিস হিস করে ফাইজান খান বলল, "তুমি নিশ্চয়ই একা নও। বলো, তোমার সাথে আর কে কে আছে?"

আবীর মুখে কিছুই বলল না, বরং মুখভঙ্গি যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ফাইজান খানের মুখের দিকে। আবীরের কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে ফাইজান খান শীতল গলায় বলল, "ঠিক আছে। বলতে না চাইলেও ক্ষতি নেই। এক ভাইরাসে কাজ না হলে আরেক ভাইরাসে তো আলবত হবে!"

কথাগুলো বলেই ঘড়ি দেখল ফাইজান খান, তারপর আবার তাকালো আবীরের দিকে। ফাইজান খান আবার বলতে শুরু করল, "আর মাত্র দশ মিনিট পরেই আমাদের ৬০ টা ড্রোন আকাশে উড়বে। আর তারপর যেখানেই এফিব্যান ভাইরাসের ডেনসিটি কম বলে ডিটেক্টেড হবে, আমাদের ড্রোনগুলো সেখানেই ছড়িয়ে দেবে বিষাক্ত ভাইরাস। আর তারপরই শুরু হয়ে যাবে লাশের মিছিল!"

কথাগুলো বলেই ফাইজান খান অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আবীর চুপচাপ তাকিয়েই রইল ফাইজান খানের মুখের দিকে, তার চোখের চাহনিতে কেমন একটা তাচ্ছিল্যের

ভাব! আবীরের সেই চাহনিকে তোয়াক্কা না করে ফাইজান খান বলল, "অবশ্য তোমাদের আমি একটা সুযোগ দিতে পারি। তোমরা, মানে তুমি আর তোমার সাথে যে বা যারা আছে, সবাই যদি আমাদের হয়ে কাজ করতে রাজি থাকো, তাহলে তোমাদেরকে সেই লাশের মিছিলে সামিল হতে হবে না।" কিছুক্ষণের জন্য থামল ফাইজান খান, তারপর ভ্রু নাচিয়ে বলল, "এখন বলো, কোনটা বেছে নেবে? জীবন, নাকি মৃত্যু?"

"ধাঁআঁআঁইঁইইইইইই!!!"

গুলির শব্দ ভেসে এলো বাইরে থেকে। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে গেল সবার! সোলায়মান মোল্লা চমকে উঠে চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, চেয়ারের ওপর ভর করে উঠে দাড়ালো সে। ফাইজান খান হতবাক হয়ে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত, তার মুখে যেন আর কথা সরে না!

"কে ওখানে? কে গুলি করল!" দরজার দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলো ফাইজান খান, "গার্ডস! ইমতিয়াজ! রেজওয়ান! কোথায় মরলে সব?!"

"আমি দেখে আসছি।" অস্বাভাবিক রকমের শান্ত গলায় কথাটা বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালেন প্রফেসর রাজ্জাক। তারপর হাটা ধরলেন দরজার দিকে।

"হু-হুউজুর! ইয়ে মা-মানে স্যার, আ-আমি কি যামু প-প্রফেসরের লগে?" তোতলাতে তোতলাতে বলল সোলায়মান মোল্লা।

ফাইজান খান মুখে কোন কথা না বলে হাত নেড়ে ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে সোলায়মান মোল্লা প্রফেসর রাজ্জাকের পেছন পেছন চলে গেল। ফাইজান খান পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। হাত পা থরথর করে কাপছে তার। আবীর বুঝতে পারল, ফাইজান খান সবাইকে ধমকের ওপর রাখলেও সে নিজে প্রচণ্ড রকমের ভীতু!

"ধাঁআঁআঁইঁইই!"

আরো একটা গুলির শব্দ ভেসে এলো বাইরে থেকে! লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালো ফাইজান খান। বাইরে কী হচ্ছে সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

"ওরে বাবারে! মাইরালাইসে আমারে!!" শোনা গেল সোলায়মান মোল্লার গগনবিদারী আর্তনাদ!

ফাইজান খানকে অবাক করে দিয়ে আবীর গলা উচিয়ে বলল, "স্যার, আপনি ঠিক আছেন তো?"

"হ্যা আবীর," বাইরে থেকে ভেসে এলো প্রফেসর রাজ্জাকের গলার স্বর, "এই হারামজাদা সোলায়মান পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল, আসিফ একদম সময়মত ওর হাতে গুলি করেছে!"

"কী হচ্ছে এসব?!" ফাইজান খান গর্জে উঠলো, প্রচণ্ড রাগে তার মুখ দিয়ে এখন উর্দু বের হচ্ছে। "প্রফেসর! তুমি আমার সাথে বেঈমানী করেছ, আমি দেখে নেব তোমাকে!"

"বেঈমানী তো আমি এত দিন ধরে নিজের দেশের সাথে করে এসেছি ফাইজান খান। এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করছি!" বাইরে থেকে আবারও ভেসে এলো প্রফেসর রাজ্জাকের গলার স্বর, "আর হ্যা, তুমি আমার ছাত্রকে নিয়ে লজ্জা পাবার কথা বলছিলে না? কান খুলে শুনে নাও তাহলে ফাইজান খান, আমার ছাত্র আবীরকে নিয়ে আজ আমার গর্ব হচ্ছে!"

"তোকে আমি দেখে নেব প্রফেসর!" রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো ফাইজান খান।

ফাইজান খানের রাগকে অগ্রাহ্য করে বাইরে থেকে প্রফেসর রাজ্জাক আবীরের উদ্দেশ্যে বললেন, "আবীর, ঐ মাথামোটা রামছাগলটাকে তুমি সামলাও। আমি আসিফকে সঙ্গে নিয়ে এগোচ্ছি।" প্রফেসর রাজ্জাক কথাগুলো বলেই আসিফকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত পায়ে হাটতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে একসময় মিলিয়ে গেল তাদের দু'জনের পায়ের শব্দ।

"এসব কেমন করে হল?" রাগে গজগজ করতে করতে আবীরকে জিজ্ঞেস করল ফাইজান খান।

ফাইজান খানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল আবীর, তার সেই হাসিতে ঝরে পড়ল ফাইজান খানের প্রতি তাচ্ছিল্য। শান্ত স্বরে সে বলল, "আসলে ব্যাপারটা কি জানো ফাইজান খান? ব্যাপারটা হচ্ছে, সোলায়মান মোল্লার মত জানোয়ারদের জন্মই হয়েছে নিজের দেশের সাথে বেঈমানী করে তোমাদের দাসত্ব পালনের জন্য। কিন্তু তাই বলে রাজ্জাক স্যারও যে সোলায়মান মোল্লার মত চিরকালের জন্য তোমাদের দাসত্ব মেনে নেবেন, এ কথা তুমি ভাবলে কী করে ফাইজান খান?"

রাগের চোটে ফাইজান খানের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হচ্ছে না, সে কেবল ফোস ফোস করতে লাগল। এদিকে আবীর তার মত করেই বলে যেতে লাগল, "প্রফেসর জাওয়াদ বিন রাজ্জাক প্রথম থেকেই ছিলেন কিছুটা বিভ্রান্ত, আর সেই সঙ্গে যোগ হয়েছিল তার অর্থের লোভ। অর্থের লোভে অন্ধ হয়ে তিনি হাত মিলিয়েছিলেন তোমাদের সঙ্গে। তিনি যে নিজের দেশের সাথে, নিজের দেশের মানুষের সাথে যে তিনি কত বড় বেঈমানী করছেন, সেই বোধটা তার মধ্যে একটিবারের জন্যেও জাগ্রত হয় নি। কিন্তু তার চোখ খুলে যায় তখন, যখন তিনি দেখলেন তার পরিবার পরিজন কেউ এই ভাইরাসের আক্রমণ থেকে বাঁচে নি। তার স্ত্রী, তার ছেলেমেয়ে, সবাই এই ভয়াবহ ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত! অর্থ সম্পদের পাহাড় গড়ার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা তো তার পরিবারেরে জন্যই! তার পরিবারই যদি না থাকে, তবে এত কিছু দিয়ে তিনি কী করবেন?"

দম নেয়ার জন্য থামলো আবীর, তারপর আবার বলতে শুরু করল, "নিজের দেশ, নিজের জাতিকে আঘাত করলে সেই আঘাত নিজের গায়েও লাগে। রাজ্জাক স্যার যে নিজের দেশের সাথে বেঈমানী করে নিজের পায়েই কুড়াল মেরে বসেছেন, এই অপরাধবোধ তার মধ্যে কাজ করতে শুরু করে। এই অপরাধবোধ আর বিবেকের

তাড়ণা থেকেই রাজ্জাক স্যার গত পরশুদিন আমাদের সাথে দেখা করেন। নিজের সব ভুল ত্রুটি স্বীকার করে তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দেন, আমাদের মিশনে সব রকম সাহায্য তিনি করবেন। আমরা যা যা চাইব আর ঠিক যেভাবে চাইব, তার সবকিছুই তিনি ব্যবস্থা করে রাখবেন। তিনি আমাদেরকে প্রয়োজনীয় অনেক ইনফরমেশন দিয়েছেন। আর আজ আমাদের এখানে ঢোকার রাস্তাও তিনিই করে দিয়েছেন।"

"অবশ্য তিনি যে আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের সাহায্য করতে চাইছেন," ফাইজান খানের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে আবীর বলেই যাচ্ছে, "এরকমটা আমার সেদিন-ই সন্দেহ হয়েছিল যেদিন আমরা প্রথম এখানে রেকি করতে এসছিলাম। সেদিন রাজ্জাক স্যার ইচ্ছে করেই সব গার্ডদের দরজা ভাঙার কাজে ব্যস্ত রেখেছিলেন, যাতে আমরা সহজে পালিয়ে যেতে পারি।"

কথা শেষ করে থামলো আবীর। ফাইজান খান এতক্ষণ আবীরের দিকে তার রক্তচক্ষু তাক করে রাখলেও এখন আর চোখে চোখ রেখে তাকানোর মত জোর পাচ্ছে না সে। পায়ের ওপর দাড়িয়ে থাকার শক্তিও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে, পা দু'টো ঠক্ ঠক্ করে কাপছে! ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। সবকিছু যে এভাবে ভণ্ডুল হয়ে যাবে তা সে কল্পনাও করতে পারে নি!

হঠাৎ একটা মৃদু গুঞ্জনের শব্দ ভেসে এলো বাইরে থেকে। আবীর আর ফাইজান খান দু'জনেরই দৃষ্টি চলে গেল জানালার দিকে। গুঞ্জনটা ক্রমশ বাড়ছেই! কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল গুঞ্জনটা আসলে কীসের। জানালা দিয়ে দেখা গেল নিচে থেকে একটার পর একটা ড্রোন ওপরে উঠছে, তারপর সেই ড্রোনগুলো একেকটা একেক দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

ক্রুর হাসি খেলে গেল ফাইজান খানের মুখে। আবীরের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "কী হে ছোকরা? খুব তো বড় বড় কথা বলছিলে এতক্ষণ! এখন হাওয়া বেরিয়ে গেল

তো? এরপর যখন একের পর এক লাশ পড়তে শুরু করবে তখন টের পাবে, কত ধানে কত চাল!" কথাগুলো বলেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ফাইজান খান।

আবীর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই রইল সবক'টা ড্রোন চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত। দেখতে দেখতে সবগুলো ড্রোন যখন তার দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেল, তখন সে জানালার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকালো ফাইজান খানের দিকে। ফাইজান খান অবাক হয়ে দেখল, আবীরের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি উঁকি দিচ্ছে। ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে সেই হাসি! বিকশিত হতে হতে এক পর্যায়ে তা রূপ নিলো অট্টহাসিতে!

২৩.

এদিকে শাপলা চত্বরে চলছে ব্যাপক হৈ চৈ! নারী, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ লোক সেখানে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই হতবাক হয়ে ঠায় দাড়িয়ে আছে, বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে, একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করছে তারা এখানে কী করে এলো!

কিছুক্ষণ আগেই এই মানুষগুলোর ওপর থেকে ভাইরাসের প্রভাব কেটে গেছে। কিন্তু এখনও প্রায় কয়েক হাজার লোক ভাইরাস আক্রান্ত রয়ে গেছে! তারা কেউ ইতস্তত হেটে বেড়াচ্ছে, আবার কেউ কেউ সামনে যাকেই পাচ্ছে তার দিকেই তেড়ে যাচ্ছে! কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে গুটি কয়েক মানুষকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে শ'খানেক ভাইরাস আক্রান্ত মানুষ, তাদের পেছনে আবার কয়েকজন ছুটছে পিচকারি হাতে। কয়েক হাজার মানুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে, কেউ উঠে বসার চেষ্টা করছে। অনেকের আবার কোনো নড়া চড়াও দেখা যাচ্ছে না!

ড. সাইফ রাজুর সঙ্গে যেই দলটা এখানে এসেছিল তাদের প্রত্যেকের সাথে ছিল চারটা করে স্মোক বোম্ব। প্রত্যেকের চারটা করে মোট আশিটা স্মোক বোম্বের ধোঁয়ায় পুরো শাপলা চত্বর ছেঁয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণ আগে, এখনও সেই ধোঁয়া পুরোপুরি কাটে নি। কিন্তু ধোঁয়ার সাথে ভাইরাসের এ্যান্টিডোট বোধহয় সবার কাছে ভালোমত পৌছায় নি, কিংবা সবার ক্ষেত্রে এই এ্যান্টিডোট হয়ত সমানভাবে কাজ করে না; কারো ক্ষেত্রে খুব দ্রুত কাজ করতে শুরু করে, আবার কারো ক্ষেত্রে ধীরগতিতে। যারা এখনও ভাইরাসের প্রভাবমুক্ত হয় নি, তারা অন্য সময়ের মত সামনের সুস্থ মানুষদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ছে না, বরং ইতস্তত হেটে বেড়াচ্ছে যেন তারা বিভ্রান্ত!

কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে টলতে টলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, আবার উঠে দাড়ানোর চেষ্টা করছে। হয়ত তাদের নিঃশ্বাসের সাথে এ্যান্টিডোট খুব সামান্য পরিমাণে প্রবেশ করায় তারা ভাইরাসের প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারছে না। পুরনো দুমড়ানো মোচড়ানো বাসগুলো দিয়ে তৈরি নড়বড়ে স্টেজের ওপরে উঠে দাড়ালেন সাইফ রাজু। তিনি গলা খাকারি দিয়ে সামনে থাকা সবার উদ্দেশ্যে উচু গলায় বললেন, "আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। জানি, আপনাদের মনে এখন অনেক রকমের প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মত সময় বা সুযোগ কোনোটাই এখন আমাদের নেই। আমাদের দেশ এখন খুব কঠিন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, আমরা সবাই ভয়ানক বিপদের মধ্যে আছি! এখন যদি আমরা এই বিপদের বিরুদ্ধে রুখে না দাড়াই তাহলে আমরা কেউ বাঁচতে পারব না!"

তার কথা কেউ বুঝতে পারল বলে মনে হল না, সবাই ফ্যল ফ্যাল করে তাকিয়েই রইলো। সামনের দিক থেকে একজন বলে উঠলো, "আপনি বিজ্ঞানী সাইফ রাজু না?"
"হ্যা।" একটা ঢোক গিলে বললেন ডক্টর সাইফ রাজু। সঙ্গে সঙ্গেই সবার মধ্যে একটা গুঞ্জনের রোল পড়ে গেল। কয়েক মুহুর্ত চুপ করে থেকে ডক্টর সাইফ রাজু বললেন, "আমি জানি আমাকে নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ভুল ধারণা আছে, অনেক রকমের প্রশ্ন আছে আপনাদের আমার কাছে। আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব, কিন্ত সেটা এখন না। এখন আমাদের একটাই কাজ, দেশের শত্রুদের দেশটাকে বাঁচানো! অন্তত নিজেদের জীবন বাঁচাতে হলেও আজ আমাদের সবাইকে দেশের স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে!"

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু এদেশে হচ্ছেটা কী আসলে?!"
সাইফ রাজু একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন সবার ওপর। বেশিরভাগ লোক এখনও ঘোরের মধ্যেই আছে, কেউ জায়গায় দাড়িয়ে টলছে, কেউ হেটে বেড়াচ্ছে; অনেকে

আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। কারো কারো ঘোর এইমাত্র কেটেছে, তারা হতবাক হয়ে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। তাদের মাথায়ই আসছে না, তারা এখানে কী করে এলো!

"আমাদের দেশ একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কবলে পড়েছে।" ডক্টর সাইফ রাজু বলতে শুরু করলেন, "সেই ষড়যন্ত্র অনুসারে আমাদের দেশে একটা ভয়াবহ ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়ে পুরো দেশ দখল করে নিয়েছে একটা আন্তর্জাতিক শক্তি! ভাইরাসের আক্রমণে দেশের হাতে গোণা কিছু মানুষ বাদে সবাই নিজেদের বোধশক্তি হারিয়ে সেই আন্তর্জাতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। আপনারা সবাই এতদিন ধরে সেই ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত নিজের অজান্তে অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছেন। আজ এখানে আপনারা যারা এই ভাইরাসের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, তারা আবার যেকোন সময়ে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। তাই ওরা আবার নতুন করে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার আগেই সবাই মিলে ওদেরকে আটকাতে হবে!"

দম নেয়ার জন্য থামলেন সাইফ রাজু। একদম পেছনের দিকে দাড়ানো মানুষগুলো কিছু শুনতে পেয়েছে কিনা কে জানে! বয়স্ক একজন ভিড়ের মধ্য থেকে বলল, "কিন্তু এটা তো একটা পলিটিকাল ম্যাটার। পলিটিকাল ম্যাটার পলিটিশিয়ানদের মধ্যেই মিটমাট হোক না! আমরা তো পলিটিক্সের সাতে পাঁচেও নেই, আমাদের মত সাধারণ পাবলিকদের কেন এসবের মধ্যে টানা হ্যাচড়া করা হচ্ছে?!"

"কে বলেছে আপনারা পলিটিক্সের সাতে পাঁচে নেই?" ভ্রু কুচকে বললেন সাইফ স্যার, "আপনার দৈনন্দিন জীবনের এমন একটা কাজ কি আপনি দেখাতে পারবেন যেখানে রাজনীতির পরোক্ষভাবেও কোন প্রভাব নেই? পারবেন না। কারণ আপনার বাড়ির ইলেকট্রিক বিল দেয়া থেকে শুরু করে প্রতিদিনের গাড়ি ভাড়া পর্যন্ত সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতি! যেখানে আপনাদের সারাটা জীবনই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রাজনীতি

দিয়ে, সেখানে যদি আপনারা বলেন যে আপনারা রাজনীতি করেন না তাই রাজনীতির সাতে পাঁচেও নেই, তাহলে সেটা নিজেদের সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না!”

দম নেয়ার জন্য থামলেন সাইফ রাজু। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, “দুঃখজনক হলেও সত্যি কথাটা বলতেই হচ্ছে, আজকে দেশের এই অবস্থার জন্য আপনারাই দায়ী। হ্যা, আপনারাই। বাইরের শত্রুরা আজ আমাদের দেশে প্রবেশ করতে পেরেছে আমাদের দেশেরই কতিপয় অসৎ রাজনীতিবিদদের হাত ধরে। আর এইসব অসৎ রাজনীতিবিদদেরকে রাজনীতিতে জায়গা কারা করে দিয়েছে জানেন? আপনারাই! আপনারা দিনের পর দিন নিজেদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন এই ভেবে যে বেশ তো আছি! চাকরি আছে, ঘরবাড়ি আছে, সংসার তো বেশ চলে যাচ্ছে! কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছেন, যেই দেশে থাকছেন, খাচ্ছেন, যেই দেশের সব রকম রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করছেন, সেই দেশের প্রতি আপনার কোনো কর্তব্য আছে কিনা? সেই দেশের রাজনীতিতে আপনার কোন ভূমিকা থাকতে পারেন কিনা?”

সাইফ স্যার একটু থেমে নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর আবার বললেন, “মনে রাখবেন, একটা জায়গা কখনোই ফাকা থাকে না, সেই জায়গা আপনি না নিলে অন্য কেউ এসে দখল করে নেবে। আজ একজন সৎ মানুষ রাজনীতিতে নেই বলেই অসৎ মানুষেরা রাজনীতির মাঠে নিজেদের জায়গা করে নেবার সুযোগ পেয়েছে। আপনারা যদি সৎ হন, নিষ্ঠাবান হন, তাহলে কেন নিজেদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে অসৎ রাজনীতিবিদদের ক্ষমতাশালী হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন? আপনাদের মধ্য থেকে যারা সৎ, তারা যদি রাজনীতি থেকে দূরে সরে না গিয়ে রাজনীতিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সক্রিয় থাকতেন, রাজনীতি বিষয়ে সামান্যতম সচেতনতাও যদি আপনাদের থাকত, তাহলে আজকে হয়ত আমাদের দেশের এই অবস্থা দেখতে হত না। কিন্তু না, আপনারা দেশের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে বেছে নিলেন

রাজনীতিকে ঘৃণা করার অজুহাত! রাজনীতি খারাপ, ভালো মানুষ রাজনীতি করে না, রাজনীতি নিয়ে চিন্তাও করা যাবে না, যারা রাজনীতি নিয়ে ভাবে তারাও অসৎ- এই সমস্ত খোড়া যুক্তি দেখিয়ে আপনারা দেশের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখলেন! আর তার ফলও তো এখন আপনারাই ভোগ করছেন!”

কথা শেষ করে থামলেন সাইফ রাজু। সামনে উপস্থিত মানুষগুলোর দিকে তাকালেন। বিশেষ করে সামনের দিকের মানুষগুলোর মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করলেন এই মানুষগুলো তার সঙ্গে আছে কিনা। মুখ দেখে অবশ্য কিছুই বোঝা গেল না, কারণ সবার মুখেই বিভ্রান্তির ছাপ স্পষ্ট। প্রত্যেকেই আশেপাশের সবার সাথে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো রকম গ্রীন সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে না কারো তরফ থেকে।

“স্যার,” সবাইকে অবাক করে দিয়ে কম বয়সী একটা ছেলে সামনে এগিয়ে এলো। বেশ তেজের সঙ্গেই সে বলল, “আমি আছি আপনাদের সাথে।”

মুহুর্তের মধ্যে সবক’টা চোখ একসঙ্গে ঘুরে গেল ছেলেটির দিকে। সবাই অবাক হয়ে ছেলেটির আপাদমস্তক দেখতে লাগলো। বাচ্চা একটা ছেলে, বয়স হবে বড়জোর চৌদ্দ কি পনেরো! আর তার কিনা এত তেজ?

তার দেখাদেখি আরও বেশ কয়েকজন এগিয়ে এলো, “স্যার, আমরাও আছি আপনাদের সাথে! আপনি শুধু বলে দিন, আমাদের কী করতে হবে!”

দেখতে দেখতে আরো অনেকেই এগিয়ে আসতে লাগলো, তারাও সমস্বরে বলল, “আমরাও আছি স্যার!”

সন্তুষ্টির হাসি ফুটলো ড. সাইফ রাজুর মুখে। মনের আনন্দে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, “জয় বাংলা!”

“জয় বাংলা!!” একসঙ্গে গর্জে উঠল সবাই।

এত লোকের এক সঙ্গে একই সুরে “জয় বাংলা” বলে গর্জন শুনে গায়ের রোম দাড়িয়ে গেল সাইফ স্যারের। এ যেন বাঘের গর্জনকেও ছাপিয়ে যায়!

২৪.

আবীরের হাসি যেন আর থামছেই না, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে সে।

"তুমি হাসছ যে?" ফাইজান খানের কণ্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়ল। আর কিছুক্ষণের মাঝেই তাদের পাঠানো ড্রোনগুলো বিষাক্ত ভাইরাস ছড়িয়ে দেবে জায়গায় জায়গায়, হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে! আর সেটা জেনেও এই ছেলে কিনা হেসে গড়িয়ে পড়ছে! পাগল টাগল হয়ে গেল নাকি?

"হাসছি তোমার নির্বুদ্ধিতা দেখে!" হাসতে হাসতে আবীর বলল, "আচ্ছা ফাইজান খান, একটা কথা বলো তো! যেই পরিকল্পনা নিয়ে তোমরা ড্রোনগুলো পাঠাচ্ছ, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ড্রোনগুলোর সর্বপ্রথম কোথায় এ্যাটাক করার কথা?"

ফাইজান খান কী বলবে ভেবে পেল না, কারণ সে নিজেও জানে না। আবীর অবশ্য ফাইজান খানের জবাবের অপেক্ষায় থাকলো না, জবাবটা সে নিজেই দিয়ে দিলো।

"দেখো ফাইজান খান," বলতে শুরু করল আবীর, "বর্তমানে দেশের সব জায়গাতেই এফিব্যানের প্রভাব আছে- কোথাও বেশি, কোথাও কম। এখন যেই এলাকার বায়ুমণ্ডলে এফিব্যান ভাইরাসের পরিমাণ প্রয়োজনের চাইতে কম, সেই এলাকাতেই তোমাদের পাঠানো ড্রোনগুলো এ্যাটাক করবে, তাই তো? তা-ই যদি হয়, তাহলে ড্রোনগুলো তো সর্বপ্রথম সেই এলাকাতেই এ্যাটাক করবে যেই এলাকা এফিব্যানের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর এরকম সুরক্ষিত এলাকা তো দেশে একটাই আছে। আশা করি এখন তোমাকে এটাও বলে দিতে হবে না যে সেই সুরক্ষিত এলাকাটা কোথায়?"

আতঙ্কে সাদা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল ফাইজান খানের মুখ। তার কানের কাছে যেন মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে। কারণ সে এখন যেখানে বসে আছে, সেই কলেজ

বিল্ডিংটাই সব থেকে সুরক্ষিত এলাকা যেখানে এফিব্যানের কোন প্রভাব নেই! প্রচণ্ড রাগে নিজের মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে ফাইজান খানের। একটা বারের জন্যেও এই ব্যাপারটা কেন তার মাথায় এলো না?!

ফাইজান খানের আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখ দেখে বেশ মজা পেয়ে গেল আবীর। সে বলল, "আমি জানি এই পরিকল্পনা তোমার না, মাস্টার ক্রুগোর। ভেবো না এই ব্যাপারটা মাস্টার ক্রুগোর মাথায় আসেই নি। বরং মাস্টার ক্রুগো সবকিছু ভেবে চিন্তেই এরকম একটা পরিকল্পনা ফেঁদেছে। তোমাদের জীবনের কোন মূল্য নেই তার কাছে, তার কার্যসিদ্ধি করা দিয়ে কথা! তোমরা মরে পচে মাটির সাথে মিশে গেলেও মাস্টার ক্রুগোর কিচ্ছু আসবে যাবে না, কারণ তার হয়ে কাজ করার মানুষের অভাব নেই।"

কথাটা শেষ করেই ফাইজান খানের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসল আবীর। আবীরের সেই হাসি দেখে ফাইজান খানের মাথায় যেন রক্ত উঠে গেল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সে বলল, "তো তুমি কেন হাসছ? মরবে তো তুমিও! আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রোনগুলো ব্যাক করে এখানে চলে আসবে!"

"আসবে না।" আবীর বলল, "তোমাকে তো বলেছিই ফাইজান খান, রাজ্জাক স্যার আমাদের জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তোমাদের ড্রোনগুলো যে জিনিস বহন করছে, তা তোমাদের ভাইরাস না, আমাদের বানানো এ্যান্টিভাইরাস। যেখানেই এফিব্যান ভাইরাসের ডেনসিটি বেশি বলে ডিটেক্ট হবে, সেখানেই ড্রোনগুলো এফিব্যানের এ্যান্টিডোট ছড়িয়ে দেবে।"

"সত্যি?" বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল ফাইজান খানের।

আবীর চোখ টিপে বলল, "হ্যা।"

ফাইজান খান হাফ ছেড়ে বাঁচলো। এই প্রথমবার নিজের ব্যর্থতায় সে খুশি। খুশিতে তার ইচ্ছে করছে চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনটা ডিগবাজি দিতে!

"জয় বাংলা! জয় বাংলা!!"

চমকে উঠলো ফাইজান খান। নিজের কানকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না! একজন দুইজন না, হাজার হাজার লোক "জয় বাংলা" বলে শ্লোগান দিচ্ছে। সেই শ্লোগানের শব্দ ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসছে। সে ভুল শুনছে না তো?

"কী হচ্ছে এসব? হচ্ছেটা কী?!" চিৎকার করে উঠলো ফাইজান খান।

"শুনতে পাচ্ছ না?" মুচকি হেসে আবীর বলল, "বাঙালি তার বাঙালি সত্ত্বার জানান দিচ্ছে!"

"ইউ শাট আপ!" আবীরের দিকে তর্জনী তাক করে চিৎকার করে উঠলো ফাইজান খান। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা জানালার কাছে ছুটে গেল সে। জানালা দিয়ে নিচে তাকাতেই বিস্ফারিত চোখে সে দেখল, হাজার হাজার লোক "জয় বাংলা" বলে শ্লোগান দিতে দিতে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

"এটা হতে পারে না! হতে পারে না এটা!" বিড়বিড় করে বলতে লাগল ফাইজান খান।

"এটাই হয়েছে ফাইজান খান।" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াতে দাড়াতে বলল আবীর, "তোমরা হেরে গেছ।"

আস্তে আস্তে ঘুরে দাড়ালো ফাইজান খান। তারপর পকেট থেকে তার রিমোট কন্ট্রোলটা বের করে শীতল গলায় বলল, "খেল এখনো বাকি হে ছোকড়া! খেল তো খতম করব আমি। আমার রিমোট কন্ট্রোলের ফিঙ্গার প্যাডে একটা স্পর্শ করা মাত্রই এফিব্যান ভাইরাস আবার ছড়িয়ে পড়বে বায়ুমণ্ডলে! আর তারপর এত কাঠখড় পুড়িয়ে যে মানুষগুলোকে তোমরা ভাইরাসের প্রভাব কাটিয়ে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছ, তারাই তোমাদের টুকরো টুকরো করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে!"

আবীর কোন কথা বলল না। স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল ফাইজান খানের হাতে ধরা রিমোট কন্ট্রোলটার দিকে। সে দেখল, ফাইজান খান রিমোট কন্ট্রোলের ফিঙ্গার প্যাডে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি স্পর্শ করাচ্ছে!

দশ..... নয়.... আট.... সাত... ছয়.... পাঁচ.... চার.... তিন.... দুই.... এক.... !!!

"বুউউউউউউমমমম!!!!"

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। শ্লোগান থেমে গেল, যেন সবাই স্তব্ধ হয়ে গেছে! শয়তানি হাসি খেলে গেল ফাইজান খানের মুখে, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলল, "এখন কী বলবে ছোকড়া?"

"বলব," শান্ত স্বরে আবীর বলল, "তুমি নিজের হাতে ধরে নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছ ফাইজান খান।"

"মানে?" আবীরের কথা বুঝতে পারল না ফাইজান খান। কী বলতে চাচ্ছে এই ছেলে?

"প্রথমত যেটা বলব," আবীর আগের ফাইজান খানের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আগের মতই শান্ত গল গলায় বলল, "সেটা হচ্ছে, আমি তোমাদের হাতে ধরা পড়ি নি। বরং ইচ্ছে করেই তোমাদের হাতে ধরা দিয়েছি, যাতে করে তোমাকে এখানে ব্যস্ত রাখতে পারি।"

"কিন্তু..." ফাইজান খান কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আবীর তাকে থামিয়ে দিলো।

"বলছি।" আবীর ফাইজান খানের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, "দ্বিতীয়ত, আমি যতক্ষণ তোমাকে এখানে ব্যস্ত রেখেছি, ততক্ষণে আমাদের লোকজন তোমাদের সবকিছু নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে। সর্বপ্রথম তারা দখল করেছে তোমাদের কন্ট্রোল রূম। আর তৃতীয়ত যেটা বলব, সেটা শোনার জন্য তোমাকে একটু প্রস্তুতি নেয়ার সময় দিচ্ছি।"

আবীর কিছুক্ষণের জন্য থামলো। তার দিকে অধৈর্য ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে ফাইজান খান। সে ভেবেই পাচ্ছে না, কী এমন কথা এই ছোকড়া বলবে যা শোনার জন্যে তাকে এত সময় ধরে প্রস্তুতি নিতে হবে!

ঠিক তখনই নিচে থেকে আবার ভেসে এলো "জয় বাংলা" শ্লোগান। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দে যারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন যেন তারা আবার প্রাণ ফিরে

পেয়েছে। শুধু তাই না, আগের তুলনায় আরও বেশি জোরালো স্বরে শ্লোগান দিতে দিতে তারা এগিয়ে আসছে!

বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল ফাইজান খানের। এরা শ্লোগান দিতে দিতে এদিকেই এগিয়ে আসছে, তারমানে এফিব্যানের কোন প্রভাব-ই পড়ছে না এদের ওপর! কিন্তু এতক্ষণে তো এফিব্যানের কাজ শুরু করে দেয়ার কথা ছিল!

"আর তৃতীয়ত," আবীর ফাইজান খানকে একটা মৃদু হাসি উপহার দিয়ে বলল, "রিমোট কন্ট্রোল তোমার ছিল, বিস্ফোরণ হয়েছে তোমাদের ডিভাইসে; কিন্তু এই বিস্ফোরণের ফলে বাতাসে যেটা ছড়িয়ে পড়েছে, সেটা তোমাদের এফিব্যান নয়, এফিব্যানের এ্যান্টিডোট।"

আবীরের কথা শুনে ফাইজান খান ক্ষোভে ফেটে পড়ল। প্রচণ্ড রাগে নিজের মাথার চুল ছিড়তে ছিড়তে গগনবিদারী চিৎকার করতে লাগল সে।

আবীর মুচকি হেসে বলল, "এটাই তো হওয়ার ছিল ফাইজান খান, এবং এটাই হয়েছে। তোমরা হেরে গেছ!"

"ইউ বাস্টার্ড বাঙ্গাল!"

রাগে চিৎকার করে উঠে আবীরের বুকে একটা লাথি মারল ফাইজান খান। আবীর প্রস্তুত ছিল না, তাই সে ছিটকে গিয়ে পড়ল ঘরের আরেক কোণে লোহা লক্কড়ের জঞ্জালের মধ্যে। ঘ্যাঁচ করে তার মাথার পেছনে একটা সূচালো কিছু গেথে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল সে। ধীরে ধীরে তার চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো।

আবীর শুনতে পেল অনেক লোক একসঙ্গে হুরমুর করে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ছে। ফাইজান খানের আর্তনাদ ভেসে এলো তার কানে, "নেহি! ছোড় দো মুঝে, ছোড় দো!!" ফাইজান খান গগনবিদারী চিৎকার করেই যাচ্ছে। এক পর্যায়ে তার সেই গগনবিদারী চিৎকার চাপা পড়ে গেল অসংখ্য বাঙালির "জয় বাংলা" গর্জনের দাপটে!

আবীর টের পেল কয়েকজন মিলে তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। তার কানে ভেসে এলো দু'টো অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। তার মনে হচ্ছে কেউ যেন বহুদূর থেকে তাকে ডাকছে।

"আবীর! এই আবীর!"

"ওঠো আবীর! উঠে দ্যাখো, আমরা জিতে গেছি!"

"আমরা জিতে গেছি! শুনেছ আবীর? জিতে গেছি আমরা!"

"চোখ খোলো আবীর!"

কণ্ঠ দু'টো চিনতে পারল আবীর। সাইফ স্যার আর জোনাকি। আবীর একবার চেষ্টা করল চোখ মেলে তাকানোর। চোখের সামনে কেবল অন্ধকার দেখছে সে। আস্তে আস্তে তার সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে, যেন শরীরের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে সে! তার শরীর যেন আর তাকে সঙ্গ দিতে চাইছে না!

একটা বিচিত্র হাসি ফুটলো আবীরের মুখে। সে তার শরীরে অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি দিয়ে ক্ষীণ স্বরে বলল, "জয় বাংলা!"

আহ! কতই না শান্তি এই দু'টো শব্দ একসাথে বলার মধ্যে!

২৫.

-মাস্টার ক্রুগো। আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দেয়ার আছে।

-প্রজেক্ট পাই ফেইল করেছে। এটাই বলবে তো?

-আপনি জানেন?!

-জানি। আর তুমিও বোধহয় জানো, কোনো কিছুই আমার অজানা নয়।

-জানি মাস্টার ক্রুগো।

-ওদের বানানো এ্যান্টিডোটের সাহায্যে পুরো বাংলাদেশকে ভাইরাসমুক্ত করে এখন ওরা প্রতিবেশী দেশকে সাহায্য করতে যাচ্ছে। ঐ দেশেগুলোতে অবস্থানরত আমাদের এজেন্টদের একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

-আপনি একদম দুশ্চিন্তা করবেন না মাস্টার ক্রুগো, সবকিছু আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। ওরা কোথাও মুখ খোলা কিংবা ধরা পড়া তো দূরে থাক, ওদের কোন অস্তিত্বও খুজে পাওয়া যাবে না!

-মীরা। তুমি কি জানো আমি তোমাকে কেন এত পছন্দ করি? তোমাকে আমি পছন্দ করি কারণ প্রতিবারই আমার মনের কথাগুলো আমি বলার আগেই তুমি বলে দাও। যদিও উল্টোভাবে।

-আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না মাস্টার ক্রুগো।

-একটু আগে তুমি যে কথাটা বললে হুবহু সেই একই কথা আমিও তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম। তোমাকে আর কোন দুশ্চিন্তা করতে হবে না। শুধু তোমাকেই না, তোমার পুরো টীমকে আমি সবরকম দুশ্চিন্তা থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে যাচ্ছি।

-এ আপনি কী বলছেন মাস্টার ক্রুগো?!

-তুমি তো জানো মীরা, আমার অভিধানে ব্যর্থতা বলে কোন শব্দ নেই। আর ব্যর্থতার কোন রকম চিহ্নও আমি রাখতে চাই না। তোমরাদের পুরো টীম এখন প্রজেক্ট পাইয়ের ব্যর্থতার একটা চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই না।

-আমাদের একটা সুযোগ দিন মাস্টার ক্রুগো! আমি আপনার কাছে হাতজোর করছি!

-আজ পর্যন্ত যারাই আমার পরিকল্পনাকে সফল করতে পেরেছে আমি শুধুমাত্র তাদেরকে নিয়েই আমার পরবর্তী পরিকল্পনার দিকে অগ্রসর হয়েছি। আজ প্রজেক্ট পাই মুখ থুবড়ে পড়েছে শুধুমাত্র তোমাদের ভুলের কারণে! তোমাদেরকে নিয়ে আর কোন পরিকল্পনার দিকে অগ্রসর হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না! বরং তোমাদের ভুলের মাশুল তোমাদেরই দিতে হবে।

-দয়া করুন মাস্টার ক্রুগো! দয়া করুন!

-দয়া করেই তো এতগুলো ভুল করা সত্ত্বেও তোমাদের বাঁচিয়ে রেখেছি, ভুল শোধরানোর সুযোগ দিয়েছি। কিন্তু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার তোমরা করতে পারো নি।

-আমাদের আর একবার সুযোগ দিন! এবারের মত আমাদের ভুল ক্ষমা করে দিন!

-তোমাদের ভুল তো একটা দু'টো নয়, অগণিত! ডক্টর নীলকণ্ঠ দেবনাথের প্রজেক্ট পাইয়ের ভেতরের কথা জেনে যাওয়া, তার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই নিজেদের গা বাঁচাতে তাকে খুন করা, তোমাদের বিজ্ঞানীদের তৈরি ভাইরাসে ক্রুটি থেকে যাওয়া থেকে শুরু করে আজকে প্রজেক্ট পাইয়ের এই চূড়ান্ত ব্যর্থতা পর্যন্ত এতগুলো ভুলের কথা আমি ভুলে যাই কী করে?!

-এতটা নির্দয় হবেন না মাস্টার ক্রুগো! দয়া করুন!!

-তোমার কী মনে হয়, তোমাদের দয়া করার মত দয়ামায়া নিয়ে আমি প্রজেক্ট পাইয়ের মাস্টার প্ল্যানার হয়েছি? যে সিংহাসনে আজ আমি বসে আছি সেখানে আমি পৌছেছি লাশের সিড়ি বেয়ে! আজ আমার যে জৌলুস তা আমি অর্জন করেছি রক্ত দিয়ে গোসল করে!

-আমরা আপনাকেই এতদিন ধরে আমাদের শেষ আশ্রয় মেনে এসেছি! আপনি ছাড়া তো আমাদের আর কেউ নেই!!

-হ্যা, আমিই তোমাদের শেষ আশ্রয়। তাই তো তোমাদের সব দায় দায়িত্বও আমার। তোমরা যতদিন আমাকে সন্তুষ্ট রাখতে পেরেছ ততদিন আমি তোমাদের স্বর্গসুখ দিয়েছি। আর আজ যখন তোমাদের কাজে আমি অসন্তুষ্ট, তখন তোমাদেরকে নরকের দ্বার চেনানোর দায়িত্বও তো আমারই।

-না মাস্টার ক্রুগো! না....!!

-অনেক কথা হয়েছে, আর না। বিদায় মীরা....

-মাস্টার ক্রুগো! আপনি এরকমটা করতে পারেন না মাস্টার ক্রুগো!!

-হাস্তা লা ভিস্তা!

-না! না....!! নাআআআআ.....!!!

পরিশিষ্ট

তিন মাস পর।

এই তিন মাসে প্রজেক্ট পাই এবং এর সাথে জড়িতদের নিয়ে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। প্রথম ঘটনা- প্রফেসর জাওয়াদ বিন রাজ্জাক পাকিস্তানী এজেন্ট ফাইজান খান এবং শীর্ষ সন্ত্রাসী সোলায়মান মোল্লাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে নিজেও আত্মসমর্পণ করেছেন। ফাইজান খান আর সোলায়মান মোল্লাকে ছয় দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। রাজসাক্ষী হওয়ায় হয়ত প্রফেসর রাজ্জাকের শাস্তির পরিমাণ কিছুটা কমানো হবে।

দ্বিতীয় ঘটনা- রিমান্ডের প্রথম দিনেই সোলায়মান মোল্লা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। সেদিন রাতেই হাসপাতালের কেবিন থেকে উধাও হয়ে যায় সোলায়মান মোল্লা। কেবিনে হাত পা বাধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় চিকিৎসারত ডাক্তারকে, তার পরনে ছিল এ্যাপ্রনের পরিবর্তে সোলায়মান মোল্লার পোশাক। তার জবানবন্দি থেকে জানা যায়, সেদিন তিনি যখন সোলায়মান মোল্লার ব্লাড প্রেশার চেক করছিলেন, তখন হঠাৎ সার্জিক্যাল মাস্ক পড়া দু'জন লোক কেবিনে ঢুকে পড়ে, তাদের দু'জনেরই পরনে ছিল সাদা এ্যাপ্রন। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোক দু'জন তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তার হাত পা বেঁধে ফেলে। আর সোলায়মান মোল্লা তার এ্যাপ্রন গায়ে চাপিয়ে মুখে সার্জিক্যাল মাস্ক লাগিয়ে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কেবিনের বাইরে দুইজন কনস্টেবল পাহারায় ছিল, তারাও সেদিন থেকেই লাপাত্তা! সেদিন সোলায়মান মোল্লার মত একজন অপরাধীর পাহারায় মাত্র দুইজন কনস্টেবলকে কেন রাখা হয়েছিল, সেই দুই কনস্টেবল দু'জন এখন কোথায়

আছে, হাসপাতালের সেদিনের সব সিসিটিভি ফুটেজ কীভাবে উধাও হয়ে গেল- এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আজও অজানা!

তৃতীয় ঘটনা- ফাইজান খানকে জেরা করে জানা যায় সে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর এজেন্ট। পাকিস্তান থেকে তাকে পাঠানো হয়েছিলো মাস্টার ক্রুগো নামে একজনের হয়ে কাজ করার জন্যে। ফাইজান খান আরো জানিয়েছে, সে মাস্টার ক্রুগোর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেছে ঠিকই, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনোদিনও তার চেহারাও দেখে নি সে। অবশ্য পাকিস্তান সরকার এই ঘটনার দায় নিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্য- এই ফাইজান খান কোনো পাকিস্তানী এজেন্ট না, বাংলাদেশ সরকার ফাইজান খানকে পাকিস্তানী এজেন্ট সাজিয়ে পাকিস্তানকে হেয় করার ষড়যন্ত্র করছে। মাস্টার ক্রুগোরও কোনো রকম হদিস পাওয়া যায় নি।

তবে মাস্টার ক্রুগো হোক আর মিস্ট্রেস ক্রুগোই হোক, এই ঘটনার পেছনে যে অনেক বড় মাপের কোন রাঘব বোয়াল আছে সেটা কিছুদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল, যখন ফাইজান খানকে তার সেলের ভেতরে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করা হল। পোস্ট মর্টেমে তার পেটে পটাসিয়াম সায়ানাইড পাওয়া গেছে। এত কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ফাকি দিয়ে ফাইজান খানের সেলে এই জিনিস কী করে পৌছালো, সেটা এক বিরাট রহস্য!

তবে সবচাইতে মজার ব্যাপার হল, এই তিন মাসের ব্যবধানে সবাই সবকিছু ভুলে গেছে। মাত্র তিন মাস আগেই যে দেশের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে, তা যেন কারো মনেই নেই। হয়ত মনে পড়বেও না, আরো একবার দেয়ালে পিঠ ঠেকে না যাওয়া পর্যন্ত!
এই কারণেই বোধহয় এই জাতিটাকে বলা হয় গোল্ডফিশ মেমোরির জাতি!

****

আবীর গত তিন মাস ধরে কোমায়। তার জ্ঞান কবে ফিরবে কিংবা আদৌ কোনোদিন ফিরবে কিনা তা চিকিৎসারত ডাক্তাররাও নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না। জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা অবশ্য খুবই কম, তার অবস্থার কোন রকম উন্নতি দেখা যায় নি এই তিন মাসেও।

আবীরের মায়ের সময় এখন কাটে হাসপাতালের করিডরে বসে ছেলের জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায়। গত তিনটা মাস তিনি এভাবেই কাটিয়েছেন। ভাইরাসের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার পর পরই তিনি তার পরিবারকে খুজতে বেরিয়ে পড়েন। তার স্বামী কিংবা মেয়ে- দু'জনের একজনকেও খুজে পাওয়া যায় নি। একের পর এক হাসপাতালে খোঁজ করতে করতে একদিন কাকতালীয়ভাবে তার দেখা হয়ে যায় বিজ্ঞানী সাইফ রাজুর সঙ্গে। সাইফ রাজু তখন জোনাকি আর দীপকে সঙ্গে করে আবীরের ফ্যামিলি এ্যালবাম থেকে নেয়া ছবি হাতে আবীরের পরিবারকে খুজে বেড়াচ্ছিলেন। আবীরের মাকে খুজে পাওয়া মাত্রই তিনি তাকে আবীরের কাছে নিয়ে যান।

আবীরের মা এখন চব্বিশ ঘণ্টা হাসপাতালেই পড়ে থাকেন। মাঝেমধ্যে দীপ আর জোনাকিও আসে, এসে তাকে সান্ত্বনা দেয়। সাইফ স্যারও সময়ে সময়ে এসে খোজ খবর নেন, আবীরের মাকে সাহস দেয়ার চেষ্টা করেন। তারা সবাই-ই অধীর অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন! কে জানে আর কত দিন তাদেরকে এইভাবে অপেক্ষা করে কাটাতে হবে! আর এই অপেক্ষার অবসানই বা কী দিয়ে হবে!

আবীর কি ফিরে আসবে? নাকি গোল্ডফিশ মেমোরির এই জাতির প্রতি হতাশা নিয়েই হারিয়ে যাবে চিরতরে??

সমাপ্ত

সংগ্রহ করুন আজই

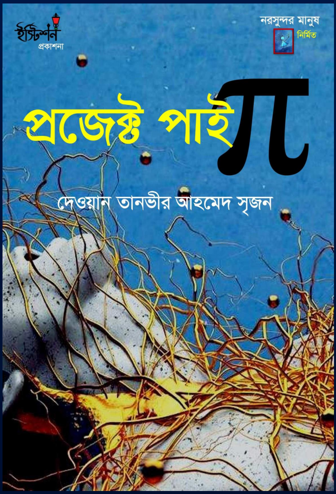

ইস্টিশন ইবুক ওয়েব থেকে!

π

দেওয়ান তানভীর আহমেদ সৃজন, বয়সে নবীন হলেও লেখায় তার পরিপক্কতা দেখতে পাওয়া যায় প্রবলভাবেই! আদতে যার মধ্যে একবার দেশপ্রেম আর মানুষের সমতার চিন্তা কাজ করতে শুরু করে; তাকে বয়সের বিচারে চিহ্নিত করার চেষ্টা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়!

লেখকের মানবিক বোধ আর বিজ্ঞান প্রেমের মিলিত রূপ দেখতে পাওয়া যায় তার প্রথম ইবুক ***প্রজেক্ট পাই***-তে! সাবলীল কিবোর্ডের ছোয়ায় তিনি তুলে এনেছেন বাংলাদেশে ঘটে চলা এবং ঘটে যাওয়া মন-মনন-মানবিকতার গল্প!

ইস্টিশনের পাঠকদের নতুন এ গল্পে ডুব দেবার নিমন্ত্রণ রইল!

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com